বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প

রুহুল আমিন রোকন
ও অসিত মৈত্র

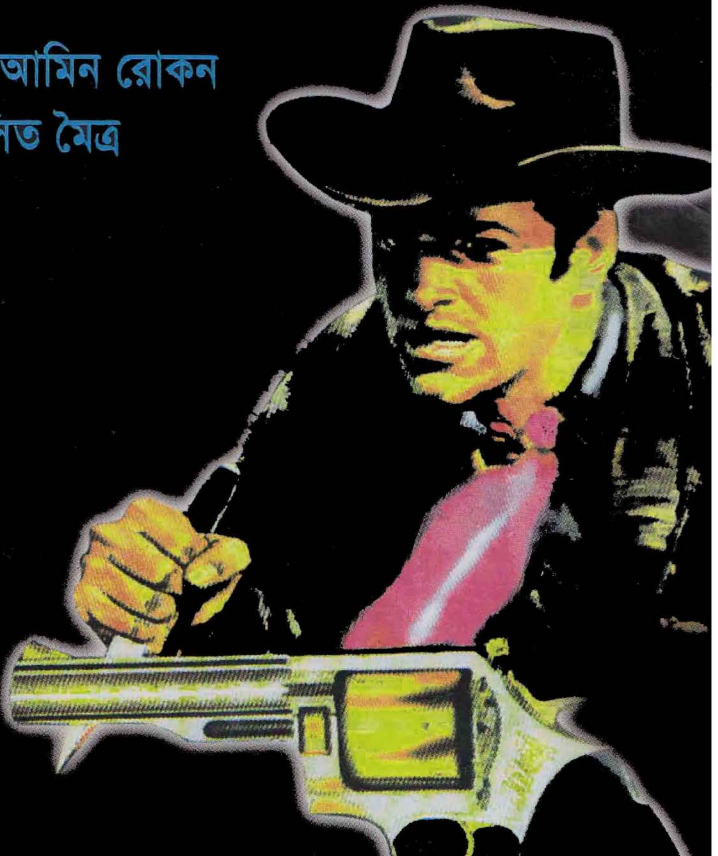

BELAL

EXCLUSIVE

BANGLAPDF

Please, Give us Some Credit When U Share Our Books

Visit Us At BANGLAPDF.NET

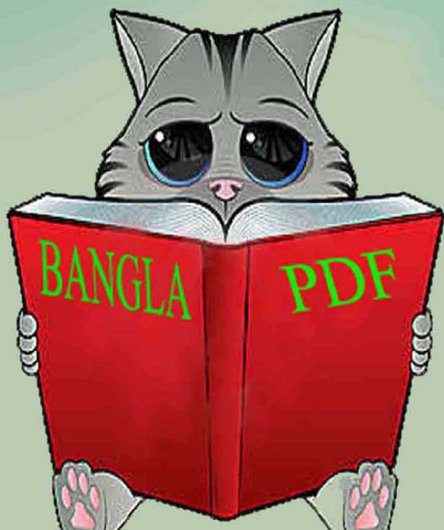

Scanning & Editing

BELAL AHMED

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ
গোয়েন্দা গল্প

সম্পাদনা ও ভাষান্তর

[illegible] আমিন রোকন ও অসিত মৈত্র

সাহিত্যমালা ● ঢাকা

প্রকাশনায়
সাহিত্যমালা
৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০০৯ ইং

প্রচ্ছদ
নয়ন গ্রাফিক সিস্টেম

স্বত্ব
অনুবাদক ও সম্পাদক

শব্দ বিন্যাস
তুষার কম্পিউটার
৩/১, প্রতাপ দাস লেন, ঢাকা

মুদ্রণে
হাওলাদার অফসেট প্রেস
১নং গোপাল সাহা লেন, ঢাকা

দাম : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN- 984-798-190-x

পরিবেশক : আশীর্বাদ প্রকাশনী, ঢাকা।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ

গোয়েন্দা গল্প

সূচীপত্র

গল্প	লেখক	পৃষ্ঠা
নিছক ইন্দ্রজাল	জ্যাক রিচি	৯
ফাঁকাঘর	ডোনাল্ড হনিং	২৩
মিঃ বাডের প্রেরণা	ডরোথী সেয়ার্স	৩৭
সে এক রহস্যময়ী	জেমস হেডলী চেজ	৫৩
খুনীর নাম স্ট্যান	জর্জ সিমেনোঁ	৬৪
অদৃষ্টলিপি	সিরিল হেয়ার	৯৪
কাঁটায় কাঁটায়	রবার্ট এডমন্ড অল্টার	১০৩

নিছক ইন্দ্রজাল

(মেনস্ টু বি সীন)

জ্যাক রিচি

দেখুন, ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই ভাল হচ্ছে না। দস্তুরমতো ট্যাক্স দিয়েই আমি এ শহরে বাস করি। —বেশ কঠিন স্বরে পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললাম। —আপনারা আমার বাড়ি-ঘরদোর সব তছনছ করে দিচ্ছেন! আমার সাধের বাগানটা খুঁড়ে-খুঁড়ে একাকার করে দিয়েছেন! এই সব ব্যাপক খানা-তল্লাশির শেষে আমার যাবতীয় সম্পত্তি যেখানে যেমন ছিল ঠিক তেমনভাবে আবার আপনাদের সাজিয়ে রেখে যেতে হবে।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট লিটলার স্মিত হাসলেন। —এ-সব নিয়ে আপনি বেশি চিন্তা করবেন না, মিঃ ওয়ারেন। এর সব দায়-দায়িত্ব আমাদেরই। এখান থেকে কিছু পাওয়া যাক আর না-যাক, আমরাই আবার সমস্ত কিছু আগের মতো যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে যাব।

'কিছু পাওয়া যাক' বলতে তিনি অবশ্য আমার স্ত্রীর মৃতদেহের কথাই বোঝাতে চাইছেন, যদিও এখনও পর্যন্ত তার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি।

—আমার বাগানটা কিন্তু পুরোপুরি সাজিয়ে দিয়ে যেতে হবে, সার্জেন্ট। এখানকার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আপনার লোকেরা বুঝি তার ওপর দিয়ে লাঙ্গল চালিয়ে গেছে। গোলাপের চারাগুলোর যে কী হাল হয়েছে তা ঈশ্বরই জানেন। সামনের লনটার অবস্থাও তথৈবচ। এর ওপর একটু আগে দেখলাম, আপনার লোকেরা শাবল-গাঁইতি নিয়ে মাটির নীচের গুদোম ঘরটাও খুঁড়তে শুরু করেছে। এমনভাবে উপদ্রব করলে ভদ্রলোকদের শেষকালে শহর ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করতে হবে দেখছি!

রান্নাঘরের মধ্যে বসেই আমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। লিটলারের চোখে-মুখে তখনও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে তিনি বললেন—আমাদের এই যুক্তরাষ্ট্রের মোট আয়তন হচ্ছে তিরিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশ ঊননব্বুই বর্গমাইল। এর মধ্যে পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, মরুভূমি সমস্তই ধরা আছে।

লিটলার নিশ্চয় এই সমস্ত পরিস্থিতিতে নিজেকে একজন জাঁদরেল পুলিশ-অফিসার হিসেবে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই সংখ্যাটা মুখস্থ করে রেখেছেন।

—এর মধ্যে হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জ বা আলাস্কাও কি যুক্ত করা আছে ? —ঈষৎ বিদ্রুপাত্মক স্বরেই প্রশ্ন করলাম আমি।

তিনি কিন্তু ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হলেন না। আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে নিজের কথার খেই ধরে বললেন—কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি তার স্ত্রীকে খুন করে মৃতদেহটা লুকিয়ে ফেলতে চায়, তবে সে তার নিজের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই সেটা করতে চাইবে।

তা ঠিক! আমিও মনে মনে তাঁর যুক্তিটা মেনে নিলাম। খুনির পক্ষে সেটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। কেননা বনে-জঙ্গলে গর্ত করে লুকিয়ে ফেললেও শেয়াল-কুকুরের হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই। একবার সন্ধান পেলে তারা ঠিক টেনে-হিঁচড়ে মৃতদেহটা মাটির তলা থেকে বের করে আনবে। অনেক সময় বয়-স্কাউটরাও দল বেঁধে বনেজঙ্গলে পিকনিক করতে যায়। মাটি খুঁড়তে গিয়ে ব্যাপারটা তাদেরও নজরে পড়ে যেতে পারে।

লিটলার মৃদু হাসলেন। তারপর ভারীক্কি চালে জিজ্ঞেস করলেন—বাগান আর বাড়ি মিলিয়ে আপনার মোট জমির পরিমাণ কতখানি ?

—ষাট বাই একশ পঞ্চাশ বর্গফুট। কিন্তু আপনি কি জানেন দো-আঁশ মাটি দিয়ে বাগানটা গড়ে তুলতে কত বছর পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে ? তার মধ্যে আপনার ভাড়া-করা মজুররা খুঁড়ে-খুঁড়ে বাগানটার যা অবস্থা করেছে, চোখে দেখা যায় না! এখন এই বাড়িটাও ভেঙে মাঠ করে ছেড়ে দেবে বলে মনে হচ্ছে!

ঘণ্টাদুয়েক হল লিটলার এখানে এসেছেন। এখনও তিনি সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত। কথাবার্তার মধ্যেও তাই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মিছিমিছি কেন আপনি এত শঙ্কিত হচ্ছেন, বুঝতে পারছি না! আমার তো মনে হয়, আশঙ্কা করার মতো ওর চেয়ে আরও অনেক গুরুতর কোনও কিছুর সম্মুখীন আমরা হতে চলেছি!

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাড়ির পেছন দিকের খোলা অংশটা পরিষ্কার নজরে পড়ে। গোটা দশেক জন-মজুর পুলিশের তদারকিতে সেখানটা খুঁড়ে খুঁড়ে অসংখ্য পরিখার মতো বানিয়ে ফেলেছে। ডিটেকটিভ সার্জেন্ট লিটলার আমার পাশে সরে এসে সেদিকে নজর দিলেন।

—এ-সব ব্যাপারে আমাদের কাজকর্ম খুবই নিখুঁত। আমরা আপনার চিমনির ঝুলকালি পরীক্ষা করে দেখব। তাপচুল্লির ছাইভুসোও বাদ দেব না।

—আমার তাপচুল্লিতে ছাইভুসো কিছু পাবেন না, কারণ ওটা তেলে জ্বলে। কাপের মধ্যে আরও খানিকটা কফি ঢালতে-ঢালতে আমি বললাম। —তা ছাড়া আমি আমার স্ত্রীকে খুনও করিনি। এমন কী ও কোথায় গেছে তাও আমি জানি না।

লিটলারও পট থেকে গরম কফি ঢেলে তাঁর কাপটা আর একবার ভর্তি করে নিলেন। মর্জিমাফিক চিনি মেশালেন চামচে করে। —আপনার স্ত্রীর এই আকস্মিক অন্তর্ধানের কী জবাব দেবেন আপনি ? —নিরাসক্ত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি। তারপর কফির কাপে চুমুক মারতে শুরু করলেন তারিয়ে-তারিয়ে।

পুরানো কথাই আমাকে আবার নতুন করে বলতে হল। বললাম—এমিলি কোথায় গেছে আমি জানি না। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি ও বাড়ি নেই। সেই সঙ্গে ওর একটা ছোট স্যুটকেস এবং কয়েকটা পোশাক-আশাকেরও কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। তা হলে এমন অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত হবে না যে, ও আমাকে কিছু না জানিয়েই অন্য কোথাও চলে গেছে। ওর জিনিসপত্রের হিসেবে নিলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

—কিন্তু তাঁর কী-কী জিনিসপত্র ছিল আমরা জানব কী করে ? —আমি লিটলারকে এমিলির যে ফটোটা দিয়েছিলাম সেই দিকে তাকিয়ে-তাকিয়েই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। —যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা প্রশ্ন করি। এই মহিলাটিকে আপনি বিয়ে করেছিলেন কী উদ্দেশ্যে ?

—কেন! ... ভালবেসে ...!

কথাটা অবশ্য আমার নিজের কানেই খুব হাস্যকর ঠেকল। লিটলারও যে সে কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেননি, সেটা তাঁর মুখের ভাবেই বোঝা গেল।

—আপনার স্ত্রীর একটা মোটা অঙ্কের জীবন-বীমা আছে, তাই না ? তিনি হঠাৎ মারা গেলে সেই পুরো টাকাটা তো আপনি-ই পাবেন ?

—হ্যাঁ, তা অবশ্য পাব। —আমি স্বীকার করলাম। কথাটা নেহাত মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বাইরের লোক ব্যাপারটাকে এই চোখেই দেখবে।

তবে টাকাটাই যে একমাত্র কারণ, তা নয়। এমন কী প্রধান কারণও নয়। আসল কথাটা হচ্ছে এমিলিকে আমি আর মোটেই বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। যে কোনও উপায়ে ওর হাত থেকে মুক্তি চাইছিলাম।

এমিলিকে যখন আমি বিয়ে করি তখন যে আবেগে গদগদ হয়ে সে-কাজ আমি করতে গিয়েছিলাম, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। সে রকম ধাতই নয় আমার। কিন্তু বেশি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার পর হঠাৎ খেয়াল হল, এবারে একটা বিয়ে না করলে ব্যাপারটা বড়ই দৃষ্টিকটু দেখাবে। নিজেকে আমার কেমন অপরাধী-অপরাধী বলে মনে হতে লাগল।

এমিলি আর আমি একই অফিসে চাকরি করতাম। আমাদের কোম্পানির নাম মার্শাল পেপার প্রোডাক্টস্। আমি সেখানকার সিনিয়র অ্যাকাউনটেন্ট, এমিলি অতি সাধারণ একজন টাইপিস্ট। কোনওদিন যে তার বর জুটবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। দেখতে শুনতে খুবই শাদামাটা, মিনমিনে স্বভাবের। কথাবার্তার ধরণ-ধারণও ছিল খুব বোকা-বোকা। লেখাপড়াও বিশেষ কিছু শেখেনি। দৈনিক পত্রিকাটাও কোনওদিন উলটে দেখত কি না সন্দেহ।

এক-কথায় বলতে গেলে কোনও মানুষ যদি বিয়ের মধ্যে থেকে রোমান্সের নির্যাসটুকু ছেঁটে ফেলে শুধু তার ব্যবস্থাপনাটুকু নিয়ে ঘর করতে চায়, তবে তার পক্ষে এমিলি-ই হচ্ছে আদর্শ স্ত্রী। কিন্তু আইন-মাফিক বিয়েটা একবার হয়ে যাবার পর মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র যে কীভাবে রাতারাতি পালটে যেতে পারে এমিলিকে দেখার আগে সে-বিষয়ে আমার কোনও ধারণা ছিল না। ওর ভাললাগা-মন্দলাগা এখন যেন সবই আমায় হিসেব করে চলতে হবে। কোথাও এতটুকু পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। তা হলেই ও একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। তার ওপর নিত্য নৈমিত্তিক খুঁটিনাটি ঝগড়াঝাঁটিতো সারাদিনই লেগে আছে। এমনটি যে হবে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এমিলিকে বিয়ে করার ফলে ও অন্তত আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, এই রকমই আশা করেছিলাম।

—আপনাদের দাম্পত্য জীবন কেমন কাটছিল ?

লিটলারের প্রশ্নে মুখ তুলে তাকালাম। বলতে ইচ্ছে করছিল, খুবই সাংঘাতিক। কিন্তু তা না বলে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম। বললাম—কোনও-কোনও বিষয়ে আমাদের মধ্যে সামান্য কিছু মনোমালিন্য ঘটে থাকত, তবে পৃথিবীর কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই বা তা না ঘটে বলুন ?

সার্জেন্ট দেখলাম খোঁজ-খবর বেশ ভালই রাখেন। বললেন —আপনার প্রতিবেশী কিন্তু সম্পূর্ণ উলটো কথা বলেন। তাঁদের বক্তব্য, আপনাদের দু'জনের মধ্যে সারাক্ষণই ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকত।

প্রতিবেশী বলতে তিনি নিশ্চয় ফ্রেড আর উইলমা ট্রিবারের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। কেননা, একমাত্র তাঁদের বাড়িটাই আমার বাড়ির ঠিক মুখোমুখি।

পেছন দিকে আমার বাগান ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে মরিসনদের বাড়ি। এমিলির ঝগড়ুটে গলার স্বর হয়তো সে-পর্যন্তও গিয়ে পৌঁছতে পারে। বিয়ের পর থেকে ও যেমন গায়ে-গতরে বাড়তে শুরু করেছিল, ওর গলার আওয়াজও তেমনি জোরালো হচ্ছিল দিন দিন।

—ট্রিবাররা কিন্তু প্রত্যেক সন্ধ্যেতেই আপনাদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পেতেন!

—যখন তাঁরা হাঁপিয়ে উঠে নিজেদের মধ্যে পৈশাচিক মারামারি-কাটাকাটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতেন, তখনই হয়তো তাঁরা সে সুযোগ পেতেন। তা ছাড়া আমাদের দু'জনের চিৎকার-চেঁচামেচি-ই যে তাঁদের কানে গিয়ে পৌঁছত, এটাও সম্পূর্ণ মিথ্যে। কারণ ঝগড়ার সময়েও আমার গলা কখনও চড়ত না।

—গত শুক্রবার সন্ধেয় তাঁরা আপনার স্ত্রীকে শেষ দেখেছিলেন। তিনি তখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন।

অফিস থেকে ফেরার পথে সুপার-মার্কেট থেকে নিজের ডিনার ও নিজেই কিনে আনত। ফ্রিজে-রাখা ঠাণ্ডা খাবার-দাবার আর আইসক্রীম। রন্ধন-শিল্পে ওর ব্যক্তিগত অবদান বলতে শুধু এইটুকুই। আমি নিজেই আমার প্রাতরাশ তৈরি করে নিতাম। লাঞ্চ সারতাম কোম্পানির কাফেটারিয়ায়। সন্ধেবেলায় কোনদিন রেস্তোরাঁ থেকে ডিনার-প্যাকেট নিয়ে ফিরতাম, কখনও বা স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেই সামান্য কিছু খাবার-দাবার তৈরি করে ফেলতাম।

—হ্যাঁ, বাইরের কেউ হয়তো ওই সময়েই ওকে শেষ দেখে থাকবে, কিন্তু সেদিন সারা সন্ধেটাই আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। রাতে শুতেও গেছি একসঙ্গে। অথচ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি ওর বিছানা খালি। সেইসঙ্গে টুকিটাকি কয়েকটা জিনিসপত্রেরও কোনও খোঁজ পেলাম না। মনে হয় আমাকে কিছু না জানিয়েই এমিলি কোথাও চলে গেছে।

ভারী হাতুড়ি আর শাবল গাঁইতির আওয়াজে মালুম হল এবার ওরা ভূগর্ভস্থ গুদোমঘরের শান-বাঁধানো মেঝেটা খুঁড়তে শুরু করছে। তার ফলে এত বেশি শব্দ হচ্ছিল যে আমি বাধ্য হয়ে রান্নাঘরের পেছন দিকের দরজাটা এঁটে বন্ধ করে দিলাম। —আমি ছাড়া এমিলিকে শেষ কে দেখেছে বললেন ?

—মিঃ এবং মিসেস ট্রিবার।

উইলমা ট্রিবার আর এমিলির মধ্যে অনেক ব্যাপারে গভীর সামঞ্জস্য ছিল। দু'জনেই বেশ দশাসই চেহারার, অতিরিক্ত বদমেজাজী, আর দু'জনের মনটাও ছিল অতিশয় ক্ষুদ্র। এত নীচ স্বভাবের মহিলা সচরাচর খুব কম দেখা যায়। অপরপক্ষে ফ্রেড ট্রিবার আকারে-প্রকারে খুব ছোটখাটো, ভীতু প্রকৃতির মানুষ। ভদ্রলোকের চোখ দেখে মনে হয় তিনি যেন সব সময় ভয় পেয়েই আছেন। তবে তাঁর স্বভাবটাই এই রকম, না কি বিয়ের পর থেকে বৌয়ের থাদানি খেতে-খেতে এমন হয়ে গেছেন, সেটা আমার ঠিক জানা নেই। ভদ্রলোক কিন্তু দাবা খেলায়

বেশ পাকা, এবং আমার বেপরোয়া দৃঢ় চরিত্রের জন্যে তিনি মনে মনে আমাকে শ্রদ্ধা করেন অবশ্য হিংসেও যে একটু না-করেন তা নয়।

—ওই দিন মাঝরাতে—নিজের কথার খেই ধরে লিটলার বললেন—ফ্রেড ট্রিবার আপনার বাড়ির মধ্যে থেকে হঠাৎ এক অমানবিক চিৎকার শুনতে পেয়েছিলেন।

—অমানবিক চিৎকার!

—হ্যাঁ, তিনি নিজে ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করেছেন।

—ফ্রেড ট্রিবার একজন মিথ্যেবাদী! —রাগে গরগর করতে-করতে আমি বললাম।—আশা করি তাঁর স্ত্রীও সেটা শুনছেন?

—না, তিনি তখন গভীর ঘুমে অচৈতন্য। কিন্তু এই শব্দ শুনে ভদ্রলোক জেগে উঠেছিলেন।

—আচ্ছা, এই অমানবিক চিৎকার কি মরিসনরাও শুনতে পেয়েছিলেন?

—না, তাঁরাও তখন ঘুমোচ্ছিলেন। এবং আপনার এই বাড়ি থেকে তাঁদের বাড়ির দূরত্বও খুব একটা কম নয়। কেবলমাত্র ট্রিবারের বাড়ি-ই আপনার বাড়ির পনেরো ফিটের মধ্যে—।

—পাইপে নতুন করে তামাক ভরতে-ভরতে লিটলর আবার বললেন—এমন একটা অস্বাভাবিক চিৎকারে ফ্রেড ট্রিবারের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। তিনি তাঁর স্ত্রীকেও ডেকে তুলবেন কি না সে-বিষয় চিন্তা-ভাবনা করলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বড়ই বদরাগী। ফ্রেডের চেয়ে গায়ের জোরও তাঁর বেশি। পাছে কাঁচা ঘুম ভাঙালে তিনি উঠে কোনও কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাধিয়ে বসেন, এই ভয়ে ভদ্রলোক তখনকার মতো চুপচাপ ছিলেন। যদিও রাতভর তিনি নিজে আর ঘুমোতে পারেননি। তারপর দুটো নাগাদ তিনি আবার আপনার বাড়ির বাগান থেকে মাটি কাটার মতো শব্দ শুনতে পান। পূর্ণিমার রাত বলে আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। ভদ্রলোক তাঁর ঘরের জানলা দিয়ে দেখলেন আপনি একটা কুড়ুল দিয়ে বাগানের মাটি কোপাচ্ছেন। তখন তিনি আর স্থির থাকতে না পেরে তাঁর স্ত্রীকেও ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। তাঁরা দু'জনেই আপনার সব কীর্তি-কলাপ চাক্ষুস করেছেন।

—অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে সারারাত আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করে গেছেন! আর তার ফলেই এত সব তথ্য আপনি অবগত হয়েছেন?

কণ্ঠে যথেষ্ট ব্যঙ্গের ঝাঁজ ফুটিয়ে লিটলারকে প্রশ্ন করলাম। তিনি কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। উলটো আমায় প্রশ্ন করলেন—সামান্য একটা জিনিসের জন্যে অত বড় একটা বাক্সই বা আপনি ব্যবহার করতে গেলেন কেন?

—কারণ হাতের কাছে তখন মাপসই কোনও কিছু খুঁজে পাইনি। তাই বলে আকারে-প্রকারে সেটা নিশ্চয় কফিনের ধারে-কাছে গিয়ে পৌঁছবে না। অন্তত সুস্থ মস্তিষ্কের কোনও মানুষের পক্ষে...

সে যাই হোক, মিসেস ট্রিবারও গোটা শনিবারটা নানান ধরনের ভাবনা-চিন্তা করেই কাটিয়ে দিলেন। এবং পরে যখন আপনি জানালেন যে আপনার স্ত্রী হঠাৎ কোথায় চলে গেছেন, তাঁর ফিরতে দিন কয়েক দেরি হতে পারে, তখনই মহিলার মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে ওঠে ? তিনি ভাবলেন যে আপনি হয়তো কোনওভাবে ... মানে, ... আপনার স্ত্রীর মৃতদেহটা ওই বাক্সের মধ্যে ভরে ...

আমি আমার শূন্য কাপটা আবার গরম কফি ফেলে ভর্তি করে নিলাম। তা আপনারা এসে কী দেখলেন ?

লিটলারকে এবারে কিছুটা বিব্রত মনে হল। —একটা মরা বেড়াল।

আমি ঘাড় নাড়লাম। —তা হলে একটা মরা বেড়াল কবর দেওয়াটাই আমার মূল অপরাধ ?

লিটলার মৃদু হাসলেন। —আপনি বেশ সুকৌশলে সব কিছু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন, মিঃ ওয়ারেন। প্রথমে তো বলেছিলেন কোনও কিছুই আপনি কবর দেননি!

—আমি ভেবেছিলাম এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিশ্চয় আপনাদের পুলিশি তদন্তের মধ্যে পড়ে না।

—এবং বেড়ালটা যখন আমরা খুঁজে পেলাম তখন আপনি বললেন যে, স্বাভাবিক কারণেই ওর মৃত্যু হয়েছে।

—প্রথমে আমি সেইরকমই ভেবেছিলাম।

—কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল বেড়ালটা আসলে আপনার স্ত্রীর। আর কেউ যে মাথায় ভারী মুগুর মেরে ওকে খুন করেছে তাতেও কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

—মরা বেড়াল পরীক্ষা করে দেখা আমার স্বভাব নয়।

লিটলার লম্বা করে পাইপে টান দিলেন। —আমার থিওরি হচ্ছে আপনি প্রথমে আপনার স্ত্রীকে খুন করেন, পরে বেড়ালটাকেও মারেন। কেননা, বেড়ালটা হয়তো সবসময় আপনাকে আপনার স্ত্রীর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। অথবা সেটা আমাদের এমন কোনও সূত্রের সন্ধান দিয়ে ফেলতে পারে যার ফলে আমরা আপনার স্ত্রীর মৃতদেহটা ...

—ওঃ ... সার্জেন্ট, আপনি যেন সব মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন!

সার্জেন্টের মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। —তাদের মনিব বা কর্ত্রীকে যে জায়গায় কবর দেওয়া হয়েছে, অনেক জন্তু জানোয়ারকেই সেখানকার মাটি আঁচড়াতে দেখা গেছে। প্রভুভক্ত কুকুরের ক্ষেত্রে এমন ঘটনার কথা আখচারই শোনা যায়, তবে বেড়ালের বেলাতেই বা তেমন ঘটতে বাধা কোথায় ?

আমার মাথাতেও একই চিন্তার উদয় হয়েছিল। বেড়াল-ই বা নয় কেন ?

বন্ধ দরজা ভেদ করে নীচের থেকে শাবল-গাঁইতির ঠং-ঠং আওয়াজ ভেসে আসছিল। লিটলার কান পেতে কয়েকমুহূর্ত সেই শব্দ শুনলেন। —সাধারণত

যখন কেউ হারিয়ে গেছে বা কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এমন কোনও রিপোর্ট আমাদের কাছে আসে তখন আমরা সেটা আমাদের 'হারানো ব্যক্তি অনুসন্ধান দপ্তর'-এ পাঠিয়ে দিয়ে দিন কয়েক অপেক্ষা করি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে দু-এক হপ্তার মধ্যেই সেই হারানো ব্যক্তি আবার বাড়ি ফিরে আসে। অর্থাৎ যখন আর তাদের হাতে টাকা-কড়ি কিছু থাকে না তখনই তাদের ফেরার কথা মনে পড়ে।

ঈশ্বরের দোহাই, তবে এ-ক্ষেত্রেই বা আপনারা এত তাড়াহুড়ো করে এমন সব কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করলেন কেন ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস দু-চার দিনের মধ্যেই এমিলি ফিরে আসবে। তা ছাড়া আমি যতদূর জানি, শ'খানেক ডলারের বেশি ও সঙ্গে নিয়ে যায়নি। এবং একা একা থাকতেও ও ভীষণ ভয় পায়, কারণ ও বড় বেশি পরনির্ভরশীল।

সার্জেন্ট লিটলার আকর্ণ দন্ত বিকশিত করলেন। —কিন্তু ব্যাপারটা যখন হারানো-স্ত্রী-ঘটিত হয় তখন স্বভাবতই আমরা একটু অধিক-মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠি। আর এখানে ব্যাপারটা আরও বেশি জটিল। মিঃ ট্রিবার গভীর রাতে আপনার বাড়ি থেকে নারী-কণ্ঠের আর্ত চিৎকার শুনেছেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই সেদিন চাঁদনি রাতে আপনাকে বাগানে গর্ত খুঁড়ে একটা প্রমাণ সাইজের বাক্স পুঁতে দিতে দেখেছেন। ঘটনাটা আমাদের গোচরে আসামাত্র আমরা এরমধ্যে অতি পরিচিত অপরাধের লক্ষণ খুঁজে পাই। তাই আর এক মুর্হর্তও সময় নষ্ট করিনি। আমার নিজের অবস্থাও তথৈবচ। বেশি দেরি করা আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। বরাবরের জন্যে তো আর এমিলির নশ্বর দেহটা এমনভাবে ফেলে রেখে দেওয়া যায় না! সেইজন্যেই বেড়ালটাকে মেরে কোনও রকমে দু'জন সাক্ষী ম্যানেজ করে অতবড় বাক্সসমেত মৃতদেহটা বাগানে পুঁতে দিতে হল। যদিও কণ্ঠস্বরে রুক্ষ ভাবটা যথাসম্ভব বজায় রেখেই বললাম—আর তাই আপনারা সঙ্গে সঙ্গে শাবল গাঁইতি জোগাড় করে আমার ঘরবাড়ি সব ভাঙতে শুরু করলেন ? ... কিন্তু মনে রাখবেন, এসব আমি এমনিতে ছেড়ে দেবার বান্দা নই! আপনাদের নামে আমি আদালতে মামলা করব। আপনাদের নাকের-জলে চোখের-জলে করে ছাড়ব!

লিটলার আমার শাসানিতে কর্ণপাত করলেন না। —এর ওপর আপনার বৈঠকখানার কার্পেটে রক্তের ওই দাগটাও খুবই সন্দেহজনক!

—সে আমার নিজের রক্ত, এ-কথা তো আগেই আপনাকে বলেছি। হাত ফসকে কাচের গ্লাসটা আচমকা ভেঙে ফেলেছিলাম। তাড়াতাড়ি ভাঙা কাচের টুকরোগুলো তুলে জড়ো করার সময় আঙুলটা কেটে গেল। কোনওভাবে সেই রক্তই কার্পেটে লেগে গিয়ে থাকবে। এখনও যে আমার আঙুলে ব্যান্ডেজ জড়ানো আছে তা আপনি স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন! —কাটা আঙুলটা লিটারের চোখের সামনে তুলে ধরলাম।

এতে তাঁর কোনও ভাবান্তর ঘটল না। গোমরা মুখে বললেন—ওসব সাজানো ব্যাপার আমাদের জানা আছে। পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্যে আপনি নিজেই আপনার আঙুল কেটে রেখেছেন। তাঁর অনুমানে অবশ্য কোনও ভুল ছিল না। আমি ইচ্ছে করেই নিজের আঙুল কেটে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে রেখেছি। কারণ কার্পেটে ওই রক্তের দাগটা আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যদি বা পুলিশের মনে এমিলির মৃত্যু সম্পর্কে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে তখন ওই রক্তের দাগ দেখে তারা অনেকটা নিশ্চিত হতে পারবে। পুলিশ এমিলির মৃতদেহের খোঁজে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করুক, সেটাই আমার আন্তরিক অভিপ্রায়।

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ পেছনের জানলার দিকে আমার নজর গেল। দেখলাম, মিঃ ট্রিগার পাঁচিলের বাইরে থেকে ডিঙি মেরে আমার বাগানের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দেবার চেষ্টা করছেন। পুলিশের লোকেরা কীভাবে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে সেটাই তিনি দেখতে চান। তাঁর চোখে-মুখে গভীর কৌতূহল চকচক করছে।

—ব্যাটা মজা মারবার আর জায়গা পায়নি! —রেগে মেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে স্বগতোক্তির সুরে মন্তব্য করলাম আমি। —আজ আমি ওকে শায়েস্তা করে ছাড়ব।

লিটলারও আমার পেছন-পেছন নীচে নেমে এলেন।

সাবধানে উঁচু মাটির ঢিবি আর খানাখন্দ পেরিয়ে বাগানের শেষপ্রান্তে পাঁচিলের ধারে এসে পৌঁছলাম। —এই যে মশাই, এটাকেই আপনি একজন সৎ প্রতিবেশীর লক্ষণ বলে মনে করেন ?

আচমকা এই আক্রমণে ফ্রেড ট্রিবার ভীষণ হকচকিয়ে গেলেন। আমতা-আমতা করে বললেন—না... মানে, সত্যি কথা বলতে কী, মিঃ এলবার্ট, এ-সবের জন্যে আমি আদৌ দায়ী নই। এমন কাজ আপনি করতে পারেন বলেও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু ... কিন্তু আমার স্ত্রীকে তো আপনি জানেন! ... যতসব আজগুবী উদ্ভট কল্পনা সারাক্ষণ ওর মাথার মধে ... একই রকম ঝাঁঝালো সুরে আমি বললাম—কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার সঙ্গে আর কোনও দিনই আমি দাবা খেলব না! —তারপর লিটলারের দিকে ফিরে তাকালাম। —এখানেই যে আমি আমার স্ত্রীর মৃতদেহটা লুকিয়ে রেখেছি, কোন সূত্রেই বা আপনারা সে-ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত হলেন ?

লিটলার মুখ থেকে পাইপ নামালেন। —আপনার গাড়িটা পরীক্ষা করে। ছোটখাটো দু'চারটে যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্যে ওটা মোটর মেকানিকস-এর দোকানে দেওয়া ছিল। গত শুক্রবার বিকেলে আপনি গাড়িটা আবার নিয়ে আসেন। কারখানার নিয়ম অনুযায়ী আপনার গাড়ির তখনকার মাইল মিটারের রীডিং ওদের খাতায় নোট করা আছে। তারপর থেকে গাড়িটা আর বড়জোর

আধ মাইল রাস্তা চলেছে। ওই কারখানা থেকে আপনার বাড়ির দূরত্বও আধ মাইল। লিটলার স্বভাবসুলভ স্মিত হাসলেন। —অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে, শুক্রবার বিকেলে আপনি কারখানা থেকে সোজাসুজি বাড়ি ফিরে আসেন। পরেরদিন শনিবার আপনার অফিস বন্ধ ছিল। আজ রোববার। এই দু'দিনের মধ্যে আপনি আর গাড়ি নিয়ে অন্য কোথাও বেরোননি। প্রমাণ সাইজের একটা মৃতদেহ তো আর ঘাড়ে করে দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় না!

পুলিশের দৃষ্টি এদিকেও আকৃষ্ট হয়েছে জেনে আমি খুশি হলাম। না হলে আমাকেই উদ্যোগী হয়ে অন্য কোনও কৌশলে বিষয়টা ওদের নজরে আনতে হত। —আচ্ছা, আপনারা কি এমন একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখেছেন যে, মৃতদেহটা আমি কাছাকাছি অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে পারি ?

অবজ্ঞার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন লিটলার। —কাছাকাছি জায়গা বলতে এখান থেকে চারটে ব্লক দূরে। খোলা রাস্তার ওপর দিয়ে একটা মৃতদেহ ঘারে করে এতখানি বয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায় গিয়ে পড়ে। এমন কী রাতের বেলাতেও তো তা সম্ভব নয়। শুধু এই দূরত্বের জন্যেই।

ট্রিবার এতক্ষণ ভাল মানুষের মতো বোকা-বোকা মুখ করে চুপচাপ আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন —অ্যালবার্ট, আপনার ডালিয়ার চারাগুলো তো মজুরেরা একরকম উপড়েই ফেলেছে দেখছি। আমি যদি এর থেকে গোটাকয়েক গর্ডন পিঙ্কস নিয়ে গিয়ে তার বদলে আমার কয়েকটা অ্যাম্বার গলিয়থস দিয়ে যাই, তাতে কি আপনি খুব আপত্তি করবেন ?

তাঁর কথার কোনও জবাব না দিয়ে আমি আবার বাড়ির মধ্যে ফিরে এলাম। ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল। সূর্যদেব ধীরে ধীরে মাথার উপর উঠে এবার পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছেন। সার্জেন্টের লোকেরা সারা বাড়ি প্রায় তছনছ করে ফেলল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কোনও কিছুই তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান দিতে পারল না। লিটলারও এবার অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখেমুখে একটা অনিশ্চয়তার ছায়া উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করল।

এক সময় দিনের আলোও নিভে এল। কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে ছ-টায় ভারী হাতুড়ি আর শাবল-গাঁইতির যন্ত্রণাদায়ক ঠং-ঠং আওয়াজও পুরোপুরি থেমে গেল। লিটলারের সহকারী সার্জেন্ট শিলটন আমার রান্নাঘরে এসে হাজির হলেন। তাঁকে খুবই ক্ষুধার্ত আর হতাশ দেখাচ্ছিল। প্যান্টের এখানে-সেখানে কাদামাটির ছাপ-ছাপ দাগ লেগে আছে। —না স্যার, এখানে কিছুই পাওয়া গেল না! —পাংশু মুখে ঘাড় নাড়লেন তিনি।

লিটলার দাঁত দিয়ে সজোরে পাইপটা কামড়ে ধরলেন। —তুমি কি পুরোপুরি নিশ্চিত, শিলটন ? শসস্ত জায়গাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছ ?

—হ্যাঁ, স্যার। ... আমি আমার জীবন পর্যন্ত বাজি রাখতে রাজি আছি! এখানে যদি কোনও মৃতদেহ লুকনো থাকত তবে আমরা নিশ্চয় তা খুঁজে পেতাম। এসব ব্যাপারে আমার লোকেরাও খুব দক্ষ এবং অভিজ্ঞ।

লিটলারের দু'চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল। বজ্রদৃষ্টিতে আমার দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। —আমি খুব নিশ্চিতভাবেই জানি, আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করেছেন! আমার সমগ্র সত্তা দিয়ে সে-কথা আমি অনুভব করতে পারছি! ...

একজন বুদ্ধিমান লোক যখন বোধবুদ্ধি হারিয়ে স্বভাবের বশীভূত হয়ে পড়ে তখন সে-দৃশ্য স্বভাবতই বেদনাদায়ক। লিটলারের অবস্থা দেখে আমারও খানিকটা করুণা হল। তা ছাড়া এক্ষেত্রে তিনি তো ঠিক কথাই বলছেন।

এমন সময় পেছনের দরজা ঠেলে একজন পাহারাদার ভেতরে ঢুকে লিটলারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।—এইমাত্র আমি মিঃ ট্রিবারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, স্যার।

—তা ব্যাপারটা কি ?—অস্থির গলায় জানতে চাইলেন ডিটেকটিভ সার্জেন্ট।

—ভদ্রলোক জানালেন যে বায়রন কাউন্টির হ্রদের ধারে মিঃ ওয়ারেনের একটা সামার-কটেজ আছে।

ফ্রিজ খুলে সেদ্ধ-করা মেটের প্যাকেট বের করছিলাম। আর একটু হলে সেটা আমার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে সামনে নিলাম নিজেকে। হতচ্ছাড়া ট্রিবার আর ওর বকবকানি স্বভাব দেখছি আমায় পাগল করে ছাড়বে!

লিটলারের চোখদুটো খুশিতে চকচক করে উঠল। নিজের অজান্তেই জিব দিয়ে একটা চুকচুক শব্দ করলেন তিনি। —আমার থিওরি কখনও ভুল হবার নয়। নিজের সম্পত্তির সীমানার মধ্যেই খুনিরা মৃতদেহ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

সম্ভবত আমার মুখ-চোখ ভয়ে শাদা হয়ে গিয়েছিল। —আপনি ... আপনি আমার সামার-কটেজটাও এমনভাবে খোঁড়াখুড়ি করবেন নাকি ? ... সবে দু'মাসও হয়নি আমি দু হাজার ডলার খরচ করে কটেজটাকে পুরোপুরি নতুন করে সাজিয়ে তুলেছি! আপনার ওই চাষাড়ে লোক-লস্করদের আমি কিছুতেই সেখানে ঘেঁষতে দেব না।

লিটলার অবজ্ঞার হাসি হাসলেন। —শিলটন, গোটা কয়েক ফ্লাডলাইট জোগাড় কর। সেইসঙ্গে তোমার লোকজনদেরও তৈরি হয়ে নিতে বল। তারপর আমর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। —আপনার ওই গোপন আস্তানাটা ঠিক কোথায় ?

—আমি কিছুতেই আপনাদের সেখানকার ঠিকানা জানাব না। তাছাড়া আমার গাড়ির স্পীডোমিটারের রীডিংও আপনারা পরীক্ষা করে দেখেছেন। শনিবার বিকেল থেকে গাড়িটা গ্যারেজেই পড়ে আছে।

লিটলার অল্প ইতস্তত করলেন। অবশেষে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। —স্পীডোমিটারের কাঁটায় আপনি কোনও কারচুপি করে থাকতে পারেন। সেটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। এখন স্পষ্ট করে বলুন তো, আপনার এই সামার-কটেজের অবস্থানটা ঠিক কোথায় ?

আমিও বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। —বলব না!

মৃদু হাসলেন লিটলার। —এভাবে সময় নষ্ট করার কোনও অর্থ হয় না। তবে যদি ভেবে থাকেন আজ রাতে সেখানে গিয়ে মৃতদেহটা আবার অন্য কোথও সরিয়ে ফেলবেন, তা হলে অবশ্য আমার কিছু বলার নেই।

—সে ধরনের কোনও বাসনা আমার নেই। কিন্তু স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমারও নিশ্চয় সংবিধানগত কিছু অধিকার আছে!

আমার-ই ফোনটা তুলে লিটলার বায়রন কাউন্টির প্রশাসনিক দপ্তরে যোগাযোগ করলেন। প্রয়োজনীয় জবাব আসতে পৌনে একঘণ্টার মতো সময় লাগল। তারপরই ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। —শিলটন, আর দেরি নয়। ইতিমধ্যে অনেকটা সময় আমরা নষ্ট করে ফেলেছি।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আমি বললাম—এভাবে আমার সবকিছু আপনি তছনছ করে দিতে পারেন না!। এখনই আমি মেয়রের কাছে নালিশ জানাব। আপনাকে যাতে বরখাস্ত করা হয় সে ব্যবস্থাও আমি করব। ভুলে যাবেন না, দেশে এখনও আইন আছে, আদালত আছে...

লিটলারের রসিকতার মেজাজটা তখন আবার ফিরে এসেছে। সদলবলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে শিলটনকে উদ্দেশ্য করে বললেন—তোমার ওপর দায়িত্ব দেওয়া রইল, কাল সকালে তুমি এখানে দু একজন শ্রমিক পাঠিয়ে দিও। তারা যেন সবকিছু ঠিকঠাক করে দিয়ে যায়।

ভদ্রলোকের পেছন-পেছন আমি সদর দরজায় এসে দাঁড়ালাম। —আমার ঘরবাড়ি, বাগান, লন এমন কী প্রতিটি ফুলের চারা যদি আবার আগের অবস্থায় সাজিয়ে রাখা না-হয় তা হলে কিন্তু আমার উকিলের চিঠির জন্যে তৈরি হয়ে থাকবেন।

পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে রান্না-করা মেটের কারিটাও সে-সন্ধ্যায় আমি ঠিকমতো উপভোগ করতে পারলাম না।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ খিড়কির দরজায় কেউ যেন নক্ করল খুব আলতো ভাবে। দরজা খুলে দেখি কাঁচুমাচু মুখ করে মিঃ ট্রিবার দাঁড়িয়ে আছেন।

—আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, অ্যালবার্ট!

—পুলিশের কাছে আপনি আমার সামার-কটেজের কথাটাই বা জানাতে গেলেন কেন ?

—না ... ... মানে, আমি ঠিক বলতে চাইনি, কিন্তু কথা-প্রসঙ্গে মুখ ফসকে কীভাবে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল!

অতিকষ্টে নিজের রাগটাকে সংযত করলাম। —ওরা আমার বাগানটা তছনছ করে দেবে। সবেমাত্র কটেজটা আমি মনের মতো করে সাজিয়ে তুলছিলাম। অনেক টাকা খরচ করেছি এর পেছনে।

আরও কিছুক্ষণ ধরে আমি ট্রিবারের ওপর মনের ঝাল ঝাড়তে পারতাম। কিন্তু তা না করে জানতে চাইলাম —আপনার স্ত্রী কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ?

ফ্রেড ইতিবাচক মাথা নাড়ালেন। —কাল সকালের আগে ওর ঘুম ভাঙবে না। একবার ঘুমিয়ে পড়লেই ও মড়া হয়ে যায়।

মাথায় টুপি আর গায়ে কোট চড়িয়ে ফ্রেডের পেছন-পেছন তাঁর মাটির নীচের গুদোম ঘরে হাজির হলাম। এমিলির মৃতদেহটা ক্যানভাসে ঢাকা-দেওয়া অবস্থায় এক কোণে শুইয়ে রাখা আছে। সময়টা শীতকাল, আর ঘরটাও বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। দিন দুয়েকের জন্যে একটা মৃতদেহ লুকিয়ে রাখার পক্ষে জায়গাটা খুবই উপযুক্ত। তা ছাড়া উইলমা ভুলেও কখনও এ-ঘরে পা দেয় না।

দু'জনে ধরাধরি করে এমিলির মৃতদেহটা আমার ভূগর্ভস্থ গুদোমঘরে নিয়ে এলাম। লিটলারের লোকজন খোঁড়াখুড়ি করে জায়গাটা প্রায় পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মতো করে ছেড়েছে। তারমধ্যে সবচেয়ে গভীর যে গর্তটা ছিল সেখানেই দেহটা আমরা শুইয়ে রাখলাম। ফুট দুয়েকের মতো কাদামাটি চাপা দিলাম তার ওপর। আপাতত এখানেই আমাদের করণীয় কর্তব্যের ইতি। বাকিটা শিলটানের লোক এসে কাল সকালে ভরাট করে দিয়ে যাবে।

ফ্রেডকে কিছুটা চিন্তিত মনে হল। —কাল যে আবার ওরা এসে এখানে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে না, সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিত তো, অ্যালবার্ট ?

—একশ ভাগ নিশ্চিত। —মৃদু হেসে ভরসা দিলাম তাঁকে। —একবার যেখানে খোঁজা হয়ে গেছে, কোনও কিছু লুকিয়ে রাখার পক্ষে সেটাই সবচেয়ে আদর্শ জায়গা। কাল ওদের লোক এসে এইসব খানা খন্দ ভরাট করে দেবে।

কথা বলতে বলতে আমরা আবার রান্নাঘরে এসে পৌঁছলাম।

—আমাকে কি এখনও পুরো একটা বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে ? —ফ্রেডের গলায় ম্লান বিষাদের সুর।

—হ্যাঁ ... অবশ্যই! পুলিশের মনে অহেতুক কোনওরকম সন্দেহ জাগিয়ে তোলা উচিত হবে না। বছর খানেক বাদে যখন এই ব্যাপারটা মোটের ওপর ধামাচাপা পড়ে যাবে, তখনই আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করতে পারেন। তার আগে নয়। আর যতক্ষণ পুলিশের লোক আপনার বাড়িতে অনুসন্ধানের কাজ শেষ না-করছে, লাশটা ততক্ষণ আমার এখানেই থাকবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ফ্রেডের বুক ঠেলে। —ওই দজ্জাল স্ত্রীর সঙ্গে এখনও এক বছর ঘর করতে হবে, এ-কথা ভাবতেই এখন আমার ভীষণ কষ্ট

হচ্ছে। তবে টসে যখন আপনার জিত হয়েছে তখন সুযোগটা আপনি-ই প্রথম পেলেন। এজন্যে আপনার ওপর হিংসে হলেও ভদ্রলোকের মতো আমি সেটা মেনে নিতে বাধ্য। —একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন ফ্রেড। —কিন্তু লিটলারের সামনে আপনি আমায় তখন যা বললেন, তা নিশ্চয় সত্যি ভেবে বলেন নি!

—কখন আবার কী বললাম আপনাকে ?

—কেন, দাবা খেলার কথা! বললেন যে আর কোনওদিন আমার সঙ্গে দাবা খেলবেন না! যদিও পুলিশের কাছে আমার সামার-কটেজের সন্ধান দেওয়ায় ভদ্রলোকের ওপর আমি খুবই চটে গিয়েছিলাম, এবং ওঁর সঙ্গে আর দাবা খেলবই না বলে মনস্থ করেছিলাম, কিন্তু দাবা-পাগল এই মানুষটির বিব্রত, কুণ্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মায়া হল। বললাম—না... না, ওটা একটা কথার কথা মাত্র। আমি তেমন কিছু ভেবে বলিনি।

আমার উত্তরে ফ্রেড ট্রিবার খুশি হলেন। তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। —তা হলে দয়া করে এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি দৌড়ে গিয়ে দাবার বোর্ডটা নিয়ে আসি।

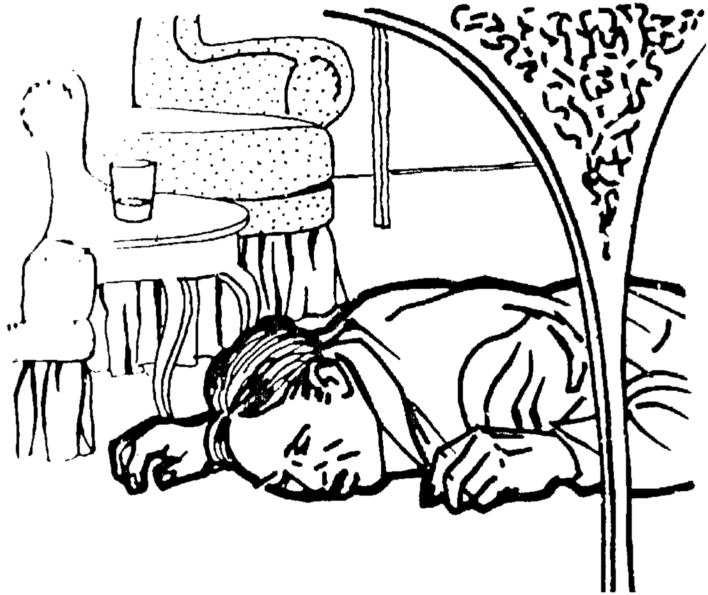

ফাঁকা ঘর

(দ্য এমটি রুম)

ডোনাল্ড হনিং

ভেতরে ঢুকে গেটটা ঠেলে বন্ধ করার সময় একটা মৃদু কিচকিচ শব্দ হল। সামনে এগোতে গিয়েও এক পলক থমকে দাঁড়াল ও, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল বাড়িটার দিকে। কালো আকাশের নীচে অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে বাড়িটা যেন বিপন্ন ভঙ্গিতে একা দাঁড়িয়ে আছে। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে ? এই মৃদু কিচকিচ শব্দটা কি তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে ? তবে তাতে ওর কিছু যায়-আসে না। ব্যাপারটা এখন এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে এইসব তুচ্ছ ঘটনা ও আর তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। যদিও এই একঘেয়ে ক্লান্তিকর দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ওর পক্ষে বড় বেশি পীড়াদায়ক। প্রত্যহ সেই একই অভিযোগের ফিরিস্তি, একই রকম চিৎকার চেঁচামেচি। এমন কী আজকাল এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করার মতোও মানসিক অবস্থা থাকে না ওর।

পায়ে-পায়ে লন পেরিয়ে ও গাড়িবারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে চাবি বের করে সদর দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকে নিঃশব্দে বন্ধও করল দরজাটা।

কিন্তু ভেতরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ওর মন আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। বিষাক্ত একটা ঘৃণার বাষ্প যেন ভারী করে তুলেছে সমগ্র পরিবেশটাকে। একটা নির্মম নিষ্ঠুর প্রতিবাদ যেন নীরবে ছড়িয়ে পড়েছে এ বাড়ির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। এবং সে-ই হচ্ছে সবকিছুর একমাত্র উৎস। আলগোছে চাবিটা পকেটে ফেলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার ঠিক মুখেই হিমেল অন্ধকারের বুক চিরে তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ ঝাঁঝ ভরা থাকলেও উচ্চারণ বেশ নিখুঁত এবং স্পষ্ট।

—কার্ল!

সিঁড়ির গোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ডান হাতে আলতোভাবে রেলিংটা ধরা। এই বিষ-কণ্ঠের অধিকারিণী এখন ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা খুব ভাল করেই জানা আছে ওর। শোবার ঘরের দরজা থেকে দু'পা এগিয়ে এসে, বারান্দার বাঁ ধারে সাবেক আমলের গ্রান্ডফাদার-ক্লকটা যেখানে ঝোলানো আছে, ঠিক তার নীচে। বরাবর এখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করে সে।

—এতদিনে ব্যাপারটা আমার রপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল—ব্যাজার মুখে ও বলল—তবুও প্রতিবারই তুমি আমায় ভীষণভাবে চমকে দাও। তুমি যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছ সেটা আমায় আগে থেকে জানতে দাওনি কেন ? অন্তত একটা আলোও তো জ্বালিয়ে রাখতে পার!

—কেন জ্বালাব ?—চাচাছোলা কণ্ঠে সে জবাব দিল। অন্ধকারে দেখা না গেলেও তার মুখের বর্তমান চেহারাটা ওর মানসপটে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঝাঁঝা-রাগে রক্তবর্ণ মুখ, দুই ঠোঁট পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় সন্নিবদ্ধ। দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে। —তুমি কি কখনও আলোতে কিছু করো ? তোমার গতিবিধির কোনও হদিশ কি কখনও আগে থেকে আমাকে জানাও ?

—আমি কোথায় ছিলাম তুমি খুব ভাল করেই জানো। —ওর কণ্ঠস্বর নির্বিকার, উত্তাপহীন। অন্ধকারটা চোখে খানিক সয়ে যাবার ফলে তার দাঁড়িয়ে - থাকা মূর্তিটাও ও এখন আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে। পেণ্ডুলামের গোল চাকাটা যেখানে অবিরাম ডাইনে-বাঁয়ে দুলে চলেছে, তার নীচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

—না, আমি জানি না। তোমার মুখ থেকে আমি সব স্পস্ট করে শুনতে চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার বিবেক তোমার মগজে গিয়ে ধাক্কা মারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি যখন যেখানে যাবে আমাকে সব জানিয়ে যাবে। সেটাই আমি চাই।

—না, আমি জানিনা। তোমার মুখ থেকে আমি সবস স্পষ্ট করে শুনতে চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার বিবেক তোমার মগজে গিয়ে ধাক্কা মারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি যখন যেখানে যাবে আমাকে সব জানিয়ে যাবে। সেটাই আমি চাই।

—দোহাই, লরা! আবার সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে শুরু করো না!

—হ্যাঁ, আমি তাই করব, আবার করব। একশ বার করব। হাজার বার করব। তুমি যতদিন না শোধরাচ্ছ ততদিন আমি সমানে করে যাব!

—অথবা যতদিন না আমি তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি ....

—না, কোনওদিনই তুমি তা পারবে না। তেমন মুরোদই নেই তোমার!

এরপর লরা কী বলবে সবই ওর মুখস্ত। সেই একঘেয়ে বাঁধা গৎ ঃ যাবার মতো কোনও চুলোও নেই তোমার। আর গিয়েই বা কী করবে ? টাকাকড়ি বলতে তোমার কিছু নেই, একটা চাকরি পর্যন্ত নেই। আমি তোমাকে থাকতে দিয়েছি, তোমার খরচ জোগাচ্ছি, তাই তুমি এখনও বেঁচে আছ। কেবলমাত্র টাকার জন্যেই আমাকে তুমি বিয়ে করেছিলে। একদিন তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, তোমাকে ভালবেসেছিলাম ...

—আঃ ... থামো! তোমার বকবকানি বন্ধ করো। —লরার কথার মাঝখানেই চেঁচিয়ে উঠল কার্ল।

—হ্যাঁ, কার্ল, আমি যা বলছি সবই খাঁটি সত্যি। সেইজন্যেই তোমার গায়ে এত জ্বালা ধরছে।

—ওহ্, আমাকে দেখছি তুমি পাগল করে ছাড়বে! কেন যে এই অবস্থাটা মানিয়ে নিতে পারছ না ... ?

—তোমাকে অনেক আগেই আমার চেনা হয়ে গেছে, কার্ল। এবং ঘেন্নাপিত্তি সত্ত্বেও তোমাকে না-হয় যাহোক করে মানিয়েও নিতে পারি। কিন্তু তুমি যা করে চলেছ তা আমি কোনও দিনই বরদাস্ত করতে পারব না। কোনও মেয়েই তা পারে না।

—ক'টা মেয়ের কথাই বা তুমি জান ?

—তুমি কি তোমার স্বভাব-চরিত্রের সমর্থনে যুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছ ? ভাবছ, যা করছ সব ঠিক করছ ?

—না, আমি কোনও যুক্তি-টুক্তির ধার ধারি না। তোমার কাছে কেন, কারুর কাছেই আমি কোনওরকম জবাবদিহি করতে যাব না। —অকপটে জবাব দিল কার্ল। সেই সঙ্গে একটা হিমেল অনুভূতিও ছড়িয়ে পড়ল ওর শিরায়-শিরায়। যেন কোনও ভয়াল ঝড়ের পূর্বাভাস। ধীরে ধীরে ওর সারা দেহ ঠাণ্ডা হতে শুরু করল। ও বুঝতে পারল প্রচণ্ড রকম একটা ঝড় উঠবে। জমাট-বাঁধা এই অন্ধকারের মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে তার উৎস। ও যেন মনে মনে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। একটা নতুন শক্তি যেন জেগে উঠতে শুরু করল ওর বুকের মধ্যে। সম্পূর্ণ অচেনা নতুন ধরনের একটা শক্তি।

লরা কি মনে করে নিজেকে ? তার ধন-দৌলত দিয়েই কি চিরদিনের জন্যে কিনে রেখেছে ওকে ? ওর নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছে বলে পৃথিবীতে আর কিছু থাকবে না ?

এই নতুন শক্তির মদির উচ্ছ্বাস কার্লকে পুরো আচ্ছন্ন করে ফেলল। বুকের মধ্যে শান্ত হিমেল স্পর্শ। ধূসর বর্ণের নিরুত্তাপ ক্রোধ যেন ধীরে ধীরে ধুঁইয়ে উঠছে ওর রক্তের ভেতর।

পায়ে-পায়ে ও এবার এগিয়ে গেল লরার দিকে।

ওর ভাবগতির দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল লরা। অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ও যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। সতর্ক, কিন্তু অবিচলিত।

—কার্ল! —ভীতচকিত কণ্ঠে লরা চেঁচিয়ে উঠল। —না, কার্ল ...

সাবেক আমলের দেওয়াল ঘড়িটার সামনেই ঝটাপতি শুরু হয়ে গেল দু'জনের। পেন্ডুলামের চাকাটা দুলতে লাগল একইভাবে। লরা ছিটকে সরে যেতে চেষ্টা করল ওর কাছ থেকে। পারল না। কার্লের দু'হাতের আঙুল তখন স্টীলের সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে লরার নরম গলা বেষ্টন করে। সেই কঠিন নিস্পেষণে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার চোখ দুটো। গলার মধ্যে একটা অস্পষ্ট ঘড়ঘড় শব্দ। দু'জনের মুখের মধ্যে এক মাত্র ইঞ্চি তিনেকের ফারাক। কার্লের শীতল দু'চোখে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, লরার দেহটা ভারী জড় পদার্থের মতো গড়িয়ে পড়ল দেওয়াল ঘেঁষে। মাথার ওপর পেন্ডুলামের চাকাটা দুলতে লাগল একই ভাবে। সেই সঙ্গে একটা মৃদু শব্দও শোনা যেতে লাগল দেওয়ালঘড়ির ভেতর থেকে। কেউ যেন জিব দিয়ে আক্ষেপ-সূচক চুকচুক আওয়াজ করে চলেছে একনাগাড়ে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে ফিরে তাকাল ও। সবকিছুই আগের মতো নীরব, নিস্তব্ধ। ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত! চিন্তা করল মনে মনে। এইমাত্র একটা খুন হয়ে গেল এখানে, অথচ ... পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর তার কোনও প্রভাব পড়ল না। এমন কী ও নিজেও কত শান্ত আর অবিচল। এতবড় একটা ঘটনার সামান্য কোনও প্রতিক্রিয়াও ওর মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে না। ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যেও দ্রুততার কোনও লক্ষণ নেই। যে দুটো হাত দিয়ে ও এমন একটা কাজ সম্পন্ন করল, সে হাত দুটোও এখন কত নির্বিকার, উদাসীন। কিছুই যেন ঘটেনি, এমন একটা ভাব নিয়েই ও এখন অন্ধকারের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক আছে, কিছুই তা হলে ঘটেনি! শাস্তির দিক থেকে বিচার করতে গেলে, লোকে যখন জানতে পারে একটা খুন হয়েছে তখনই খুনির খোঁজ পড়ে। সেই খুনি ধরা পড়লে তবেই তার বিচার। ও এখন নিশ্চয় ঢাক পিটিয়ে পাড়া-পড়শিকে বলতে যাবে না, নিজের হাতে বউকে ও খুন করেছে। ওর বউও নিশ্চয় একথা কাউকে বলবে না। আর সাবেক আমলের এই দেওয়াল-ঘড়িটা শুধু সময় জানানো ছাড়া অন্য কিছু করতে পারবে না।

পাশে বৈঠকখানার ঘরে ঢুকে ও পর্দাটা টেনে দিল। তারপর আলো জ্বালল সুইচ টিপে। জ্যাকেটটা খুলে হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রাখল। সবশেষে একটা সিগারেট

দাঁড়িয়ে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। পর্দার ফাঁক দিয়ে লরার দোমড়ানো-মোচড়ানো মৃতদেহটার খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করল ও, হাতে-ধরা জ্বলন্ত সিগারেটটা আপনা থেকেই পুড়ে যেতে লাগল। ওর মুখের সামনে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী জটলা! পাকাতে-পাকাতে ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সেদিকে কোনও লক্ষ নেই ওর। এই মৃতদেহটা নিয়ে এখন কী করা যায় ?

হঠাৎই একটা ঘটনার কথা ওর মনে পড়ল। মাত্র দিন কয়েক আগে কাহিনীটা সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। সাবেক-আমলের একটা বাড়ির ভূগর্ভস্থ গুদোম ঘরের মেঝে খুঁড়তে গিয়ে একটা কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া গেছে। কঙ্কালটা কোনও মহিলার। অনুমান করা হচ্ছে, নিদেনপক্ষে পঞ্চাশ বছর আগে মহিলাকে খুন করে এভাবে গোপনে কবর দেওয়া হয়েছে। এবং যিনি এই অপকীর্তির নায়ক তিনি বরাবর ধরা-ছোঁওয়ার বাইরেই থেকে গেছেন। সম্ভবত একজন সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবেই তিনি সারা জীবন কাটিয়েছেন, এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের যেভাবে কবর দেওয়া হয় তাঁকেও নিশ্চয় সেইভাবেই সমাহিত করা হয়েছে।

অনেক ভেবেচিন্তেই কার্ল বোগ্যান অবশেষে ভূগর্ভস্থ গুদোম ঘরে গিয়ে ঢুকল। মজবুত দেখে একটা গাঁইতিও জোগাড় করল খুঁজে-পেতে। তারপর মেঝেটা খুঁড়তে শুরু করল সেই গাঁইতি দিয়ে। প্রথম-প্রথম কাজটা খুব কঠিন মনে হতে লাগল ওর কাছে। খুবই শ্রম সাপেক্ষ। কিন্তু ওপরের সিমেন্টের পলেস্তারাটা উঠে যাবার পর ভেতরের নরম মাটি বেরিয়ে পড়ল। তখন আর ব্যাপারটা তত কঠিন ঠেকল না। ভোরের দিকে মানুষের দেহ কবর দেবার মতো একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল ও। উত্তেজনায় ওর হাত-পা সব থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। কোনওরকমে সেভাব দমন করে ওপর থেকে লরার মৃতদেহটা তুলে এনে শুইয়ে দিল গর্তের মধ্যে। মাটির নীচে মদ ইত্যাদি সংরক্ষিত রাখার জন্যে আর একটা যে ছোট ঘর ছিল তার একধারে বালি মেশানো সিমেন্ট পড়েছিল এক বস্তা। মাস কয়েক আগে কী একটা কাজে এই সিমেন্ট বালির দরকার হয়েছিল। কাজ শেষ হবার পর বাড়তি মাল-মশলাটুকু এইভাবেই রাখা ছিল এতদিন। তাতে জল মিশিয়ে ভূগর্ভস্থ মেঝের ওপরকার ক্ষতটা নিখুঁতভাবে সারিয়ে তুলল কার্ল। সবশেষে ও যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল তখন রাত শেষ হয়ে চারধারে উজ্জ্বল দিনের আলো ফুটে উঠেছে।

বদ্ধ ঘরের এককোণে পুরনো একটা বেতের চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল ও। ওর দু'চোখের দৃষ্টি কিন্তু মেঝের ওপর ওই বিশেষ অশুভ জায়গাটার দিকেই নিবদ্ধ। অবশেষে পুরনো একটা কার্পেট এনে বিছিয়ে দিল গুদোম ঘরের মধ্যে।

এখন আর লরার কোনও চিহ্ন কেউ খুঁজে পাবে না।

কিন্তু হঠাৎ করে তার এই অন্তর্ধানের ব্যাপারটা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষন করবে। এখন একটা জুতসই গল্প বানাতে হবে ওকে। কাজটা অবশ্য তেমন কিছু কষ্টসাধ্য নয়। কেননা, প্রতিবেশীদের সঙ্গে লরার খুব একটা মাখামাখি ছিল না। তা ছাড়া এ-পাড়াটার ধরণ-ধারণ এমনই যে একে অন্যের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না বললেই হয়। কার্লের অসামাজিক আচার-আচরণ, যুবতী মেয়েদের প্রতি ওর সহজাত ছোঁক-ছোঁকামি লরাকে বিশেষভাবে লজ্জিত করে তুলত। তার ধারণা পাড়া-পড়শি সকলেই যেন এ-বিষয়ে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল। আর তার ফলেই সে এড়িয়ে চলত তাদের। যদিও কার্ল ছিল অতিমাত্রায় ঘোড়েল প্রকৃতির, দিনভর ও কী করে, কোথায় যায় কেউ তার কোনও আভাস পর্যন্ত পেত না। অবশ্য লরার এই ভুল ধারণার ফলে কার্যত কার্লের-ই সুবিধে হল। হঠাৎ-করে তার এই বেপাত্তা হয়ে যাওয়াটা আপাতত অনেকেরই নজর এড়িয়ে যাবে।

লরার দূরসম্পর্কের আত্মীয়স্বজন সব ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে। কার্ল তাদের চিঠি লিখে জানিয়ে দিল যে সম্প্রতি লরা একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তবে তারা যাতে উদ্বিগ্ন হয়ে সদলবলে এখানে এসে না পড়ে, সেদিকেও খেয়াল ছিল ওর। চিঠির ভাষার মধ্যে উদ্বেগের লেশমাত্র ছিল না। কারণ লরার আত্মীয়স্বজন প্রত্যেকেই রীতিমতো ধনী। হুট করে এসে পড়তেও তাদের বিশেষ অসুবিধে হবে না। কার্ল যদিও সেই বিকেলটা শুধু চিঠি লিখেই কাটাল। প্রত্যেক আত্মীয়ের উদ্দেশে ও চারটে করে চিঠি লিখে রাখল। একহপ্তা অন্তর-অন্তর সেগুলো ডাকে পাঠানো হবে। প্রথমটাতে লরার অসুখের নানান উপসর্গ, দ্বিতীয়টায় তার অবস্থার উন্নতির কথা, তৃতীয়টায় হঠাৎ করে আবার তার শারীরিক অবনতির খবর, এবং সবশেষে মৃত্যু-সংবাদ।

এই ঘটনার পর দিনকয়েক কেটে গেল। তৃতীয়দিনে ওর খেয়াল হল, ইতিমধ্যে ও একবারও বাড়ির বাইরে বেরোয়নি। ব্যাপারটা খুবই বিসদৃশ, দৃষ্টিকটু। নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করল ও। এর মধ্যে ভয় পাবার কী আছে ? ওর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ নিশ্চয় গুদোম ঘরের মেঝে খুঁড়তে আসবে না। যদিও এই জাতীয় একটা অনুভূতিই ওর মনের মধ্যে সারাক্ষণ সক্রিয় ছিল।

এমন একটা ভাবনা-চিন্তার ফাঁকেই ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। ব্যস্ত হাতে রিসিভার তুলল কার্ল। লরার ফোন। মিসেস বোগ্যান কেন আর তার দোকানে আসছেন না, সেই কথাই জানতে চাইছিল স্থানীয় মাংস-বিক্রেতা। তাদের তরফ থেকে কি কোনও ত্রুটি ঘটেছে ?

—না ... না, তেমন কিছু নয়। —ব্যস্ত কণ্ঠে কার্ল জানাল,—মিসেস বোগ্যান একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই।

জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে সমবেদনা জানাল মাংস-বিক্রেতা। এটাই চেয়েছিল কার্ল। ও সবশেষে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

কার্ল আবার মনে মনে চিন্তা-ভাবনা শুরু করল। ফোন ধরে প্রথমে ও বলেছিল, না .. না, তেমন কিছু নয়। পরমুহূর্তেই নিজের ভুল সংশোধন করে জানিয়ে দিয়েছিল, ওর স্ত্রী এখন অসুস্থ। এ-ধরনের অসংলগ্ন কথাবার্তা বললে পাড়া-পড়শিরা সন্দেহ করে বসতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ। তারা মিসেস বোগ্যানের অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে বেশি করে খোঁজখবর নিতে শুরু করবে। ওকে আরও বেশি করে জেরা করবে।

তারওপর লরার বন্ধুবান্ধবও নিশ্চয় কিছু আছে। কথাটা মনে আসতেই কার্ল বেশ বিব্রত বোধ করল। নিজের স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে প্রায় কিছুই ওর জানা নেই। সারা দিনটাই ও বাড়ির বাইরে-বাইরে কাটাত। মাঝে-মধ্যে দিন কয়েক হয়তো বাড়িই ফিরত না। সেই সময়টা কী করত লরা ? কাদের সঙ্গে মিশত ? কাদের সঙ্গে গল্পগুজব করত ?

বিকেলের দিকে লম্বা ঘুম দিল কার্ল। একটা দুঃস্বপ্নও ওর ঘুমের গুহায় হানা দিল। ওর অবচেতন মন প্রাণপণ চেষ্টা করল ঘুম ভেঙ্গে নিজেকে জাগিয়ে তুলতে। পারল না। ঘেমে নাইতে-নাইতেই ঘুমতে লাগল ও। ভয়ে ছটফট করতে লাগল বিছানার মধ্যে। তবু ভয়াল দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পেল না। লরা যেন তার কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। দু'হাত দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। মাঝে-মাঝে হিমেল আতঙ্কে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। আবার কখনও রাগে গজরাচ্ছে। সেইসঙ্গে দু হাতের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে ব্যাকুলভাবে। সমস্ত শব্দই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে কার্ল। সেই ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে গুদোমঘরের শান-বাঁধানো মেঝেটা। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ হল সেই অন্ধকার বদ্ধ ঘরের মধ্যে থেকে। বাড়ির ভিতটাই যেন নড়ে উঠল, দরজা-জানলাগুলো সব কেঁপে উঠল থরথর করে।

কার্ল ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানার ওপর। দৃষ্টি বিস্ফারিত। দুঃস্বপ্নটা এখনও যেন জড়িয়ে আছে দু চোখের পাতায়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল চারদিকে। আশপাশের পরিবেশ শান্ত, খুবই শান্ত। এরমধ্যে গোপন কোনও ছল-চাতুরি নেই তো ? মোজা পায়েই ও ভূগর্ভস্থ গুদোম-ঘরের দিকে দৌড়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে বুকের খাঁচা ছেড়ে। আর একটু হলেই ও উলটে পড়ত নীচে নামার সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে। গুদোমঘরের মধ্যে ঢুকে ও একবার থমকে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে ব্যস্ত হাতে সরিয়ে ফেলল কার্পেটটা।

সবকিছুই আগের মতো ঠিকঠাক আছে। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলার চিহ্ন নেই। কার্পেটটা পরিষ্কারভাবে বিছিয়ে দিয়ে ও আবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকল একবার। হয়েছেটা কী ওর ? অবশেষে ব্যাপারটা ওর

মগজে ঢুকল। এর সবটই মনগড়া। ওর অবচেতন মনের গভীরে এই জাতীয় একটা ধারণা ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়ে উঠছিল। এটা তারই ফলশ্রুতি।

দ্রুতপায়ে বদ্ধ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। ও এখন সম্পূর্ণ মুক্ত, নিশ্চিন্ত। দুঃস্বপ্নের ভূতটা অনড় জগদ্দল পাথরের মতো আর ওর ঘাড়ে চেপে নেই। সদর দরজা পেরিয়ে ও এবার বাইরের সবুজ লনে এসে দাঁড়াল। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে চারধার। খোলা হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল ও। ঠিক তখনই কণ্ঠস্বরটা ওর কানে ভেসে এল।

—আরে, মিঃ বোগ্যান যে!

সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতরটা আবার অস্বস্তিতে কুঁকড়ে গেল। ওর বিবেকটা যেন পিচ্ছিল সাপের মতো পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল ওকে। পরক্ষণেই জোর করে সামলে নিল নিজেকে। এমন কী এভাবে হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠার জন্যে নিজের ওপর রাগও হল ওর।

সামনের বাড়ির এক ভদ্রমহিলা তাঁর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কার্লের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ স্থূলকায়। পরনে নীল রঙের জিনসের প্যান্ট, গায়ে শাদা শার্ট। সম্ভবত স্বামীর পরিত্যক্ত পোশাক-আশাকই তিনি এখন গায়ে চড়িয়ে আছেন। হাতে একটা বড় ধরনের ঘাস-কাটা কাঁচি।

—কেমন আছেন, মিঃ বোগ্যান ?

—ভালই। —ছোট্ট করে জবাব দিল কার্ল।

—আর মিসেস বোগ্যান ? হপ্তাখানেক হল তাঁর সঙ্গে আমার একবারও দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। বোঝ ঠ্যালা! সবেমাত্র তিন দিন আগে ঘটনাটা ঘটেছে, আর ইতিমধ্যেই ইনি এক হপ্তার গপ্পো ভাঁজতে শুরু করেছেন! এর পরেই কানাকানি চালু হয়ে যাবে। তারপর খুনের অভিযোগ উঠবে ওর নামে।

—দিন কয়েক হল ওর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না।

আবার সেই একইরকম সমবেদনার বহিঃপ্রকাশ। লরার জন্যে ভেবে ভেবে ভদ্রমহিলা যেন একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন। পরের ব্যাপারে নাক গলানো ছাড়া বুঝি আর কোনও কাজই নেই তাঁর। এরপর তিনি জানতে চাইবেন, আমি কি আপনার জন্যে কিছু করতে পারি ?

সত্যিই সেই একই প্রশ্ন করলেন মহিলা।

—না ... না, তার কোনও প্রয়োজন নেই। অসংখ্য ধন্যবাদ।

—আপনার স্ত্রী কি খুবই অসুস্থ ?

—না, মানে আমি ঠিক বলতে পারি না!

—ডাক্তার দেখিয়েছেন ?

ইতিমধ্যে ভদ্রমহিলার চোখে ও দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেছে। যদিও ঠিক খুনের অভিযোগে নয়। তারজন্যে আরও কিছু সময়ের দরকার। তবে মহিলা যে ওর

শান্ত রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠেছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর মুখচোখের চেহারা থেকেই ও সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারল।

—হ্যাঁ, ডাক্তার বললেন ওর কিছুদিন বিশ্রামের দরকার। সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

—আমি কোনও রকম সাহায্যে আসতে পারি ? তাঁর জন্যে যদি সুপ বা হালকা কিছু রেঁধে দেবার প্রয়োজন হয়...

—না... না, ধন্যবাদ, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। —তাড়াতাড়ি জবাব দিল ও। জবাবটা যেন বড় বেশি তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়ে গেল। আবার মনে মনে সতর্ক করল নিজেকে। ওর আচার-আচরণ যেন অসংলগ্ন না হয়ে পড়ে। —আমি-ই ওর দেখাশুনা করছি।

—কিন্তু আপনি যখন কাজে বেরিয়ে যাবেন, তখন ?

লোকে এখনও বিশ্বাস করে যে ও কাজে বেরোয়। ও অবশ্য পাড়া-পড়শির মনে সেই ধারণাটাই জাগিয়ে রেখেছে। তবে এই মহিলাটি দেখা যাচ্ছে খুবই নাছোড়বান্দা স্বভাবের। সন্দিগ্ধ না-হওয়া পর্যন্ত তিনি ওকে ছাড়বেন না। অবশ্য এখনও পর্যন্ত তিনি সরল মনেই যাবতীয় কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন।

—আমি একজন নার্সের বন্দোবস্ত করেছি। —ও জবাব দিল। খুব চটপট ভেবেচিন্তে কথাটা বলতে হল ওকে। এই ভাঁওতা দেওয়া ছাড়া ওর আর অন্য উপায় ছিল না।

মহিলা এবার প্রশান্ত মুখে হাসলেন। তাঁর বুকে কোনও রকম সন্দেহ দানা বাঁধার সুযোগ পেল না। এমন কী আগের সেই নাছোড়বান্দা ভাবটাও এখন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ছোট্ট একটা মিথ্যেও ঠিক জায়গামতো ব্যবহার করতে পারলে যেন ম্যাজিকের মতো কাজ দেয়। কার্লও হাসল। হাসিমুখেই পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

লন পেরিয়ে কার্ল আবার বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল। ভেতরে ঢুকে সদর দরজা লক্ করল। এইমাত্র কী বলল ও ? অথচ কথাটা না বললে তাড়ানো যেত না মহিলাকে। তিনি ঠিক নিজের হাতে সুপ তৈরি করে ওর বাড়িতে এসে হানা দিতেন। কর্তব্যপরায়ণতার পরকাষ্ঠা দেখিয়ে ছাড়তেন। মতলবটা কিন্তু আদৌ মন্দ নয়। ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করল ও। রুগীর দেখভালের জন্যে কাউকে নিয়োগ করা যদিও ওর পক্ষে সম্ভব নয়, তবে ঘর-গেরস্থলির তদারকির জন্যে তো একজনকে রাখা যেতে পারে। যে রান্নাবান্না করবে, ঘরদোর সাফসুতোর করবে। তাকে অবশ্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া থাকবে, ভুলেও যেন ওপরে কখনও না যায়। কেননা ওর স্ত্রী মৃত্যু শয্যায়, তার এখন পুরোপুরি বিশ্রামের প্রয়োজন। ডাক্তার পই পই করে বারণ করে গেছেন, কোনওভাবেই যেন তার বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটে। একথা বললে কাজের লোকের মনে নিশ্চয় আর সন্দেহ জাগবে না। ইতিমধ্যে ও-ও খানিকটা দম নেবার ফুরসত পাবে। পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে ঠাণ্ডা-মাথায় চিন্তা-ভাবনা করা

দরকার। খুন বলে কথা। ঝোঁকের বশেই হোক বা অন্য যেভাবেই হোক, দুষ্কর্মটা যখন ও-ই করে ফেলেছে তখন উদ্ধারের পথও ওকেই খুঁজে বের করতে হবে।

পরের দিন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনটা বেরুল। গৃহকর্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় একজন কাজের লোক দরকার। তাকে রান্নাবান্না করতে হবে, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, তবে নিজের কাজটুকু ছাড়া অন্য কোনও ব্যাপারে অনাবশ্যক মাথা গলাবে না।

দিন দুয়েক বাদে বেটা কুল এসে দরজার বেল বাজাল। দরজা খুলেই মহিলাকে দেখতে পেল কার্ল। যে-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয়েছিল সেই পত্রিকাটাও তার হাতে ধরা। লম্বা, ছিপছিপে গড়নের মহিলা। মুখটা একটু ফ্যাকাসে। সুন্দরী বলা চলে না, তবে এক ধরনের চটক আছে। ঠোঁট দুটো পাতলা। চোখের দৃষ্টি চিন্তাপূর্ণ। বয়স চল্লিশের নিচেই। একে অন্তত বিশ্বাস করা যেতে পারে। কার্লের অভিজ্ঞ চোখের দৃষ্টি যেন এক পলকেই বুঝে নিল তার ভেতরটা। কর্মপ্রার্থী এই মহিলা মোটেই বাচাল প্রকৃতির নয়। অনেকের অনেক গোপন কথাই তার বুকের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। বাইরের আর কেউ তা জানে না।

কথা বলে জানা গেল মিসেস কুল ডিভোর্সী। এই ধরনের ঘরের কাজ মহিলা আগেও করেছে। এ শহরের অন্য প্রান্তে একখানা ঘর নিয়ে একা থাকে। ছোট্ট করে প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া একটা কথাও বেশি বলল না সে। তার কথার সুরে খানিকটা আইরিশ টান আছে।

—রান্নাবান্না জানেন ?

—হ্যাঁ।

—ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের কাজ ?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া দরকার পড়লে আমি নার্সের কাজও করতে পারি।

—না ... না, তার দরকার হবে না। —কার্ল মাথা নাড়ল। —এটা শুধুমাত্র ঘর-গেরস্থলির কাজ। আমার স্ত্রী, মানে মিসেস বোগ্যানের এখন পরিপূর্ণ বিশ্রামের দরকার। —অসুখের গুরুত্বটা বোঝাবার জন্যে যতদূর সম্ভব ফিসফিস করে কথাটা ব্যক্ত করল কার্ল। —হপ্তায় একবার করে ডাক্তার এসে ওকে দেখে যান।

মিসেস কুল কোনও কথা বলল না, শুধু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কার্লের দিকে চেয়ে রইল। যেন আরও কিছু শুনতে চায় সে।

অতএব আবার মুখ খুলতে হল কার্লকে। সেজন্যে খানিকটা আবেগও সঞ্চার করতে হল গলার মধ্যে। আমার স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা।

মিসেস কুলের চোখে সমবেদনার ছায়া ঘনিয়ে এল।

-তার ওপর অসম্ভবরকম দুর্বল হয়ে পড়েছে, হাঁটা-চলারও শক্তি নেই। হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কার্ল। যেন বোঝাতে চাইল তার আর বাঁচার কোনও আশাই নেই।

এইভাবেই চুক্তি হল মিসেস কুলের সঙ্গে। মহিলা প্রত্যহ এসে নীচের তলার ঘরদোর সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। অসুস্থ মিসেস বোগ্যানের জন্যে রান্নাও করতে হয় তাকে। কার্ল সেই খাবার-দাবার দোতলায় লরার ঘরে নিয়ে গিয়ে দোর বন্ধ করে দেয়। তারপর নিজেই শেষ করে সেগুলো। খালি বাটি আর ডিশ নীচে নামিয়ে এনে মিসেস কুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

—আপনার রান্নার খুব তারিফ করল আমার স্ত্রী।

—ধন্যবাদ, স্যার।

মহিলাকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে কার্ল। দেখতে শুনতে খুব একটা খারাপ নয়। মোটের ওপর চলনসই বলা চলে। মহিলাও মাঝে-মাঝে চোরা-কোছে তাকিয়ে দেখে ওকে। কার্লের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে মনের মধ্যে সমবেদনা জাগে তার। কার্লও টের পায় সেটা। এই মনোভাব যে শেষকালে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তাও ও জানে। মহিলা এবং তাদের সমবেদনা সম্পর্কে ও খুবই ওয়াকিবহাল। এমন কী কার্লের জন্যে বিশেষ-বিশেষ রান্নাও করে সে। একবার খাবার পর আবার ওকে খেতে হয় সেগুলো। পাছে কোনও সন্দেহ জাগে, এই ভয়ে না বলতে পারে না।

এটাই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এক হপ্তা কেটে গেল, দু হপ্তাও কাটল। প্রত্যহ সকাল এবং সন্ধেবেলা কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর মতো কার্ল অতি যত্ন সহকারে স্ত্রীর পথ্যগুলো ট্রে-র ওপর সাজিয়ে ওপরে নিয়ে যায়। দোর বন্ধ করে একা-একা সবটা খেতে হয় ওকে। মাঝে মাঝে স্বগতোক্তির সুরে চাপা গলায় গুজগুজ ফিসফিস করে। বোঝাতে চায়, যেন স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে।

প্রতিদিন বিকেল চারটের সময় মহিলা বিদায় নেয়। একদিন তাকে বাসস্টপ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেল কার্ল।

—আপনার স্ত্রী এখন কেমন আছেন ? —জানতে চাইল মিসেস কুল।

কার্ল বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল। —সেই একই রকম। আর এটাই সবচেয়ে খারাপ লক্ষণ। এই তো গতকালই ডাক্তার এসেছিলেন। বললেন, আমার স্ত্রীর শারীরিক অবস্থার কোনও হেরফের ঘটছে না। এই পরিস্থিতিতে সেটা নাকি খুবই দুশ্চিন্তার কারণ। ও কেবল চুপচাপ শুয়ে বোবা দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা কথাও বলে না।

—নিশ্চয় তাঁর আগামী সন্তানের কথা চিন্তা করেন ?

—তাই হয়তো হবে।

কথা বলতে বলতে বাসস্টপ পর্যন্ত পৌঁছে গেল দুজনে। মহিলা এবার সোজাসুজি কার্লের দিকে ফিরে তাকাল। —সত্যি করে বলুন তো, মিঃ বোগ্যান, আপনার স্ত্রী কি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আপনি মনে করেন ?

—শুধু আপনাকে বলেই বলছি, —কার্ল জবাব দিল —আমি অন্তত তেমন কোনও সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। ডাক্তারবাবু মুখে যা-ই বলুন না কেন, তাঁর ভাবগতিক দেখেও কথাটা বুঝে নেওয়া যায়।

—আপনার ভাগ্যটা সত্যিই খুব খারাপ! এমন নিঃসঙ্গভাবে দিন-কাটানো যে কত দুর্বিষহ, কত ক্লান্তিকর, আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তা বুঝতে পারি।

—তাই না কি ? আপনাকেও এভাবে একা একা দিন কাটাতে হয় ?

—হ্যাঁ, তা তো হয়ই!

কার্ল না বলে পারল না—তা হলে আমরা নিজেরাই একে অন্যকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে সঙ্গ দিতে পারি।

মহিলার তরফ থেকে এ প্রস্তাবে বিশেষ কোনও সাড়া পাওয়া যাবে না বলেই কার্ল ধরে নিয়েছিল। কিন্তু তার উত্তর শুনে দস্তুরমতো অবাক হল।

—কোনও প্রতিবেশী যদি এক সন্ধেয় তাঁর কাছে এসে বসেন, তবে দুজনে মিলে একটা সিনেমা দেখতে যাওয়া যায়।

অতএব সেইমতো একজন প্রতিবেশী জোগাড় হয়ে গেল। এবং সেই মনগড়া প্রতিবেশীর সুবাদে কার্ল আবার নারীসঙ্গ উপভোগের সুযোগ করে নিল। মিসেস কুলের অন্তর্মুখী, চাপা স্বভাবটাও যেন দমকা ঝড়ের ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়ল টুকরো টুকরো হয়ে। তাকে এখন বড় বেশি উচ্ছ্বল আর প্রাণচঞ্চল মনে হতে লাগল।

তাদের সন্ধেগুলো এখন উজ্জ্বল হাসিখুশির মধ্যে দিয়ে, কেটে যায়। তারা একসঙ্গে নাচগান করে, খানাপিনা সারে। মিসেস কুলকে তার বাসাতেও পৌঁছে দিয়ে আসে কার্ল। ওকে দেখে মৃত্যু-পথ-যাত্রী স্ত্রীর স্বামী হিসেবে একবারও মনে হয় না এখন।

—তোমার সংস্পর্শে এসে আমি যেন আবার স্কুলের সেই ছোট্ট মেয়ের মত হয়ে যাচ্ছি, কার্ল! —খুশিতে ডগমগ হয়ে মন্তব্য করল বেটা।

—পুরনো পরিবেশে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই এই পরিবর্তনটার দরকার ছিল। অন্ততপক্ষে স্বাস্থ্যের খাতিরেও ...

—আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় আমরা যা করছি সেটা অন্যায় ?

—না, কক্ষণো না। তোমার মগজের মধ্যে থেকে এই জাতীয় ধ্যান-ধারণাগুলো পুরোপুরি হটিয়ে দাও, বেটটা। মনে রেখো, আমরা দু'জনেই রক্তমাংস দিয়ে গড়া দুটো জীবন্ত মানুষ। কিন্তু বিধাতা আমাদের ঘাড়ে দুর্ভাগ্যের দুর্বহ বোঝাই শুধু চাপিয়ে দিয়েছেন। তারমধ্যে থেকেও আমরা জীবনের খানিকটা রং-রস ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।

—তোমার স্ত্রী আর কতদিন বাঁচতে পারেন বলে তোমার বিশ্বাস ? —বেটটার গলায় চিন্তার ছোঁওয়া।

—আমার কোনও ধারণা নেই। —হতাশ ভঙ্গিতে কার্ল কাঁধ ঝাঁকাল। —ওর মধ্যে সামান্য কোনও পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। দিনরাত শুধু বিছানায় শুয়ে থাকে।

—মনে হচ্ছে আমৃত্যু তাঁকে এভাবেই পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে!

—কার্লের মনোগত বাসনা ঠিক তাই। অবশ্য এরপর কী করা উচিত সে-সম্পর্কেও ও মনে মনে জোর চিন্তা-ভাবনা করছিল। লরার মৃত্যুর কথাও ও ঘোষণা করতে পারে। তবে তাতে আরও নতুন-নতুন সব সমস্যা দেখা দেবে। প্রথমত মৃতদেহটা সমাহিত করা দরকার। এবং সে কাজটা গোপনে করা চলবে না। সকলকে জানাতে হবে। তারজন্যে একটা ডেথ সার্টিফিকেটের প্রয়োজন। তাছাড়া যারা মৃতদেহ কবর দেয় সেইসমস্ত পেশাদার লোকের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে হবে। এমন কী আলাদাভাবে কবর দিতে গেলেও এই জাতীয় সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে ওকে। বেটটাকে পুরো ঘটনাটা খোলাখুলি জানিয়ে দেবার কথাও ও একবার ভেবেছিল। সে ওকে ভালবাসে। ভালবাসলে মেয়েরা তার প্রেমিকের ক্রীতদাসী পর্যন্ত হয়ে যায়। তা হলেও ও মনে মনে ভয় পেল। ওর নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে বিরাট একটা ঝুঁকি থেকে যাবে। না, এতদূর পর্যন্ত ও এগোবে না। যদিও এ-সম্পর্কে কিছু-না-কিছু ওকে করতেই হবে। এবং সেটা যত শীগগির হয় ততই ভাল।

সম্ভবত আর একটা কাজ ও করতে পারে। সেটা হচ্ছে বেমালুম হাওয়া হয়ে যাওয়া। কথাটা শুনতে যত কঠিন মনে হচ্ছে, কার্যত ততটা নয়। অন্য অনেক হতভাগ্য মহিলার মতো পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হবার আগে কেউ হয়তো লরার কোনও খোঁজই পাবে না। সকলকে বলতে পারবে অসুস্থ স্ত্রীর হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় ও তাকে কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানেই ঘটনাটার পরিসমাপ্তি ঘটবে। কে আর কষ্ট করে মাটির নীচে গুদোমঘর খুঁড়ে মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টা করবে।

এই সমস্ত ভাবতে ভাবতেই লরার জন্যে খাবার ভর্তি ট্রে হাতে করে ওপরে উঠে গেল কার্ল। তারপর প্রাত্যহিক নিয়মমতো দরজা বন্ধ করে খাটে বসে ধীরে ধীরে শেষ করতে লাগল আহার্য বস্তুগুলো। সামনের খোলা জানলা দিয়ে ওর দৃষ্টি এখন বাইরের দিকে নিবদ্ধ। এই বাড়িটা বিক্রি করে ও অবশ্য কিছু টাকা পেতে পারে, তবে লরার নিজের নামে ব্যাংকে যে টাকাকড়ি জমা আছে তার কিছুই ও স্পর্শ করতে পারবে না। খুবই আক্ষেপের বিষয়। তবে ওর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত এইভাবেই করতে হবে ওকে।

ওর মাথায় হঠাৎ একটা নতুন মতলব খেলে গেল। সমস্ত টাকাকড়িই বা এভাবে বেহাত হয়ে যেতে দেবে কেন ? বেটটা কে লরা বলে চালিয়ে দিলে তো অনেক সমস্যার সুরাহা হয়ে যায়। পেশাদার শব বাহকেরা তো আর লরাকে চেনে না। আলাদাভাবে সমাহিত করার ব্যবস্থা করলে অবশ্য অনেক রকম

ঝুটঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। বেটটার চেনা পরিচিত আত্মীয়স্বজনও দুনিয়ায় কেউ নেই। হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে গেলে কেউ তার খোঁজ খবরও বিশেষ করবে বলে মনে হয় না। এই সামান্য ব্যাপারটা কেন যে এতদিন ওর মাথায় আসেনি সেই কথা ভেবেই ও অবাক হয়ে গেল। কত সহজ অথচ কতই কার্যকর। তবে ওকে খুব সাবধানে এগোতে হবে। একটু বেচাল হলেই মুসকিল।

খালি বাসন পত্র হাতে নিয়ে ও আবার নীচের রান্নাঘরে এসে ঢুকল।

—তোমার স্ত্রী কি সব কিছু ভাল করে খেয়েছেন ? —জানতে চাইল বেটটা।

—হ্যাঁ, ... কেন ? হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছ কেন ? —কার্ল অদ্ভুত দৃষ্টিতে বেটটার দিকে ফিরে তাকাল।

—কার্ল, —বেটটার গলায় দ্বিধা আর সংশয়ের ছোঁওয়া —তুমি কি সত্যিই আমায় ভালবাস ?

—নিশ্চয় বাসি। আমার বিশ্বাস, তুমিও তা জান। আমি এখন দিনভর শুধু তোমার কথাই চিন্তা করি।

—তোমার স্ত্রী যদি মারা যান তা হলেও তুমি আমায় এখনকার মতো ভালবাসবে তো ?

—কেন বাসব না ? তখন তো আরও বেশি করে ভালবাসার হক জন্মাবে।

—তা হলে সেদিনের আর বেশি দেরি নেই।

—তার মানে ? কী বলতে চাও তুমি ?

এঁটো বাসনপত্রের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখল বেটটা। তারপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কার্লের দিকে ফিরে তাকাল। —তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা যাতে লাঘব হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি তাঁর খাবারের মধ্যে স্বাদ-বর্ণ-গন্ধহীন এক ধরনের বিষ খুব বেশি করে মিশিয়ে দিয়েছি। এইভাবে কষ্ট পেয়ে তিলে-তিলে মৃত্যু বরণ করার চেয়ে একবারে মরা অনেক ভাল।

কার্লের মুখচোখ আতঙ্কে শাদা হয়ে গেল। সারা শরীর ঝাঁপিয়ে ঘনিয়ে-আসা একটা আচ্ছন্নের ভাবও ও এবার টের পেল স্পষ্ট করে।

—তুমি ... তুমি একটা আহাম্মক! মিসেস কুলের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে-পড়তে এই একটা কথাই ও শুধু বিড়বিড় করে উচ্চারণ করতে পারল শেষবারের মতো।

মিঃ বাডের প্রেরণা

(দ্য ইন্সপিরেশন অব মিঃ বাড)

ডরোথি সেয়ার্স

পাঁচশ পাউন্ড পুরস্কার ঃ

দৈনিক ইবণিং মেসেঞ্জার পত্রিকার তরফ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, যদি কেউ ৫৯নং অ্যাকাসিয়া ক্রেসন্টের বাসিন্দা শ্রীমতী এম্মা স্ট্রিকল্যান্ডের খুনের ব্যাপারে জড়িত পলাতক উইলিয়াম স্ট্রিকল্যান্ড ওরফে বোলটন সম্পর্কে এমন কোনও খোঁজ খবর দিতে পারেন যাতে আসামীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়, তাহলে এই পত্রিকার তরফ থেকে সেই ব্যক্তিকে নগদ পাঁচশ পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। অপরাধী যাতে আইনের হাত এড়িয়ে পালিয়ে যেতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখাই আমরা আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হিসেবে মনে করি। সেই কারণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমরা এই পুরস্কার ঘোষণা করছি।

ফেরারী আসামীর দৈহিক বর্ণনা ঃ

পুলিশের ফাইল থেকে পলাতক ব্যক্তির যে দৈহিক বিবরণ পাওয়া গেছে তা হচ্ছে ঃ বয়স ৪৩ বছর, উচ্চতা ছ ফুট এক বা দু ইঞ্চি, গায়ের রং ঈষৎ

তামাটে। একমাথা রুপোলি চুল, তবে কলপের সাহায্যে এখন তার রং বদলে নিতে পারে। ধূসর রঙের দাড়িগোঁফ, বর্তমানে কামিয়ে ফেলতে পারে। চোখের মণি ঈষৎ খয়েরি, এবং চোখদুটো ঘন সন্নিবদ্ধ। নাকটা বাজপাখির নাকের মতো ধারালো। শক্ত মজবুত দুপাটি দাঁত। হাসলে শুভ্র দাঁতের অনেকখানি নজরে পড়ে। বাঁদিকের ওপর পার্টির শেষ দাঁতটা সোনা দিয়ে বাঁধানো। সম্প্রতি একটা দুর্ঘটনায় বাঁ হাতের আঙ্গুলের নখটা থেঁতলে গেছে।

একটু চেঁচিয়ে কথাবার্তা বলে, বেশ চটপটে স্বভাবের। দেখতে শুনতে মোটের ওপর সুপুরুষ। পরনে ছাই-ছাই রঙের লাউঞ্জ-স্যুট। মাথায় পশমের টুপি। এই মাসের পাঁচ তারিখ থেকে নিখোঁজ। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে পালিয়েও যেতে পারে।

পলাতক ব্যক্তির বর্ণনাটা দু'বার করে খুঁটিয়ে পড়লেন মিঃ বাড। অবশেষে তাঁর বুক ঠেলে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। সারা লন্ডন জুড়ে এতসব হেয়ার-কাটিং সেলুন থাকতে এই শ্রীমান যে গোঁফদাড়ি কামাতে তাঁর এই অজ্ঞাত, অখ্যাত সেলুনে এসে হানা দেবে, এমন একটা অবাস্তব চিন্তা মনের মধ্যে ঠাঁই দেওয়াটাই হাস্যকর। চুলের কলপ তো আরও অনেক দূরের কথা। এমন কী লোকটা বর্তমানে লন্ডনে আছে কি না সেটাই আসল প্রশ্ন। এবং সে-বিষয়েও মিঃ বাডের ঘোরতর সন্দেহ আছে।

খুনের পর পুরো তিনটে হপ্তা কেটে গেছে। উইলিয়াম স্ট্রিকল্যান্ড নিশ্চয় পুলিশের অতিথি হয়ে বিনা পয়সায় জেলহাজতের ঝোলভাত খাবার লোভে এখনও গ্যাঁট হয়ে লন্ডনে বসে অপেক্ষা করে থাকবে না। ইতিমধ্যে শ্রীমান ভোল পালটে বিদেশে কেটে পড়েছে। এমন সম্ভাবনাই শতকরা নিরানব্বুই ভাগ। কারণ খুনিকে খুনের সুবাদে এখন তার হাতে নগদ টাকা কড়িও জমা হয়েছে বিস্তর। তা সত্ত্বেও মিঃ বাড ইভনিং মেসেঞ্জারে চাপা সম্ভাব্য খুনির দৈহিক চেহারার বর্ণনাটা মনে মনে প্রায় মুখস্থ করে ফেললেন। বলা যায় না, নসিবে লেখা থাকলে কত কী-ই যে ঘটে যেতে পারে! লটারির টিকিটও তো কখনও সখনও বরাতে লেগে যায়। অথবা শব্দ-জব্দ প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার, কিংবা ঘোড়ার মাঠের জ্যাকপট। বর্তমানে এই চরম আর্থিক সঙ্কটের দিনে যে কোনও জায়গায় টাকাকড়ির গন্ধ পেলেই মিঃ বাডের মনপ্রাণ চনমন করে ওঠে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়। সেটা দশ পাউন্ড বা দশ হাজার পাউন্ড যাই হোক না কেন।

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে এমন পড়তি বয়সেও মিঃ বাডের অন্তঃকরণ এই ধরনের পুরস্কার-প্রাপ্ত নামের তালিকার দিকে তাকিয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। তাঁর দোকানের ঠিক বিপরীত দিকে আর একটা চুল কাটার সেলুন আছে। সেই দোকানের মালিক গত বছর মাত্র ন-পেন্সের এক লটারির টিকিটের দৌলতে প্রচুর টাকা পেয়েছিল, এবং সেই টাকায় একটা আনাজপাতির দোকান তো

কিনেইছে, উপরন্তু নিজের হেয়ার-কাটিং সেলুনটাও সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছে নতুন করে। এমন কী মহিলাদের চুল ছাঁটার জন্যে আলাদা একটা বিভাগও খুলে দিয়েছে আধুনিক কায়দায়। তার ঠাটঠমকই পুরোপুরি আলাদা। একবার তাকিয়ে দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না। দোকানের বাইরে সুদৃশ্য সাইনবোর্ডের ওপর রং-বেরঙের আলোর খেলা। ভাড়া-করা কর্মচারিদের পোশাক আশাকও কত কেতাদুরস্ত, ঝকঝকে তকতকে। তারফলে ওই সেলুনটায় এখন সারাক্ষণ যুবতী মেয়েদের লাইন লেগে থাকে। ওই দোকানে চুল ছাঁটার জন্যে তারা চারদিন অপেক্ষা করে থাকতেও রাজি, তবু ভুলেও তাদের কেউ কোনওদিন ম্যাড়মেড়ে আলো-জ্বলা মিঃ বাডের এই খুপরির মতো সেলুনটার দিকে চোখ তুলে তাকায় না।

দিনের পর দিন নিজের দোকানে বসে এই একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হয় মিঃ বাডকে। ঈর্ষায় তাঁর বুক জ্বলে, তবু কিছু করার নেই। কেবলমাত্র গরীব-গুরোরাই মাঝে-মধ্যে তাঁর দোকানে এসে ঢোকে। তারা শুধু সস্তার খদ্দের। যদিও হেয়ার-ড্রেসিংয়ের ব্যাপারে তিনি যে একজন জাত-শিল্পী, সেটা তিনি নিজে খুব ভাল করেই জানেন। সুযোগ পেলে সামনের দোকানের ওই বুড়বাক খদ্দেরদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েও দিতে পারেন তাঁর হাতের কেরামতি। তাঁর হাতের কাজ দেখলে ঠাট-সর্বস্ব ওই সেলুনের কর্মচারিদের চোখ সব ট্যারা হয়ে যাবে। ওখান থেকে চুল কেটে যারা বেরিয়ে আসে তাদের মাথার পেছন দিকের ছাঁট দেখে বাড নিজেও ঘাবড়ে যান। মাথার গড়ন অনুসারে কীভাবে ঘাড়ের চুল ছাঁটতে হয় সেই সম্পর্কে ছিটেফোটা জ্ঞানই নেই ওদের কারুর। যে কোনও আজেবাজে জাগায় বছর দু-তিন শিক্ষানবীশ থাকার পরই আজকালকার ছেলে মেয়েরা নিজেদের মস্তবড় হেয়ার-ড্রেসার মনে করে। মাথার আকৃতি অনুযায়ী ঘাড়ের ছাঁটই যাদের রপ্ত হয়নি তাদের কাছ থেকে আরও সূক্ষ্ম কারুকাজ আশা করা, নিরেট পাথরের দেওয়ালে চোখবুঝে কিল মারারই সামিল।

তারপর আছে চুলে রং করার বিভিন্ন ধরনের কায়দা-কানুন। এটা হচ্ছে বাডের একটা প্রিয় বিষয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ব্যাপারটা রপ্ত করতে হয়েছে তাঁকে। প্রাণ-চঞ্চল ওই যুবতীদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর কাছে চুলে রং করাতে আসে-তবে বাড প্রথমেই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মেহগনি গাছের মতো পিঙ্গল-বর্ণের কলপ থেকে নিবৃত্ত করবেন। কারণ এই ধরনের কলপের ফলে তাদের ধাতু-নির্মিত রোবটের মতো দেখায়। তা ছাড়া বহু বিজ্ঞাপিত এই কলপটির ব্যবহারে মাথার ত্বকে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায় কি না সে-সম্পর্কেও স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলতে পারে না। তাদের চুল রং করার ক্ষেত্রে বাড তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। বহু পরিশ্রমে, বহু অধ্যবসায়ে তাঁকে এই জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। যদিও কুলি-মজুর বা বেকার ভবঘুরে ছাড়া বাডের দোকানে কেউ মাথা গলায় না। চুলে রং করার মতো বিলাসিতার কথা ভাবতেই পারে না

তারা। তারা শুধু সস্তা খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সামনের ওই সেলুনটার মতো তাঁর সেলুনটাই বা আলো-ঝলমলে হয়ে উঠবে না কেন ? কোথায় ঘাটতি আছে বাডের ?

মিঃ বাডের এই দুর্দশার কারণটা অবশ্য খুবই দুঃখজনক, এবং বর্তমান কাহিনীর সঙ্গেও তার কোনও সংযোগ নেই। তবুও সংক্ষেপে ঘটনাটা জেনে রাখা দরকার।

রিচার্ড নামে এক ছোট ভাই আছে মিঃ বাডের। ছোট ভাইকে দেখাশুনা করবেন বলে মৃত্যু-পথ-যাত্রী বিধবা মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। তাঁরা তখন নর্দ্যামটনের এক মফস্বল শহরে থাকতেন। সেখানে একটা হেয়ার-কাটিং সেলুনও ছিল বাডের। তাঁর ব্যবসাও তখন বেশ রমরম করে চলত। একটু বড় হয়ে রিচার্ড সেখানকার এক ব্যাংকে কেরানির চাকরি পেল। তখন থেকে হরেকরকম দুর্বুদ্ধিও চাড়া দিয়ে উঠল ওর মাথার মধ্যে। হতভাগ্য মিঃ বাড অবশ্য এরজন্যে নিজেকেই দায়ী মনে করেন বেশি করে। একটা মেয়ের সঙ্গে প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ল রিচার্ড। সেই সঙ্গে রাতারাতি বড়লোক হবার আশায় ঘোড়দৌড়ের মাঠেও যাতায়াত শুরু করল নিয়মিত। ফলত সচরাচর যা ঘটে থাকে ওর বরাতেও তাই ঘটল। দেনার জ্বালায় অস্থির হয়ে ব্যাংকের ক্যাশ ভাঙল একদিন। তবে এ-সব ব্যাপারে ও ছিল একবারেই আনাড়ি। তাই ধরাও পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ওদের ব্যাংক ম্যানেজার ছিলেন কড়া ধাতের মানুষ। তিনি কারুর কোনও কথা না শুনে সরাসরি পুলিশের হাতে সঁপে দিলেন রিচার্ডকে। বাড-ই তাঁর ভায়ের হয়ে ব্যাংকের সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিলেন, পাওনাদারদের বকেয়া শোধ করলেন, এবং যতদিন ধরে এইসমস্ত গোলমাল চলছিল। ততদিন রিচার্ডের প্রেমিকার দেখভালও করলেন নিজের থেকে। তারপর ঝুটঝামেলা মিটে গেলে নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্যে গাঁটের কড়ি খরচ করে দুজনকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন।

এতসব করতে গিয়ে বাড নিজে প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়লেন। তা ছাড়া এমন একটা কাণ্ডের পর চেনা-পরিচিতদের কাছে মুখ দেখাতেও ভীষণ লজ্জা করত তাঁর। অবশেষে একদিন সামান্য যা-কিছু পুঁজিপাটা অবশিষ্ট পড়েছিল তাই নিয়ে সোজা লন্ডনে পালিয়ে এলেন। এখানে এসে এই পিমলিকো অঞ্চলে ছোট দেখে একটা হেয়ার-কাটিং সেলুন খুলে বসলেন। প্রথমদিকে খুব একটা মন্দ চলছিল না সেলুনটা। কস্টেসৃষ্টে হলেও খাওয়া-পরাটা চলে যাচ্ছিল কোনওরকমে। কিন্তু রাস্তার বিপরীত দিকে ওই সেলুনটা রাতারাতি ফুলে-ফেঁপে ওঠায় এখন তাঁর ব্যবসাপত্তর প্রায় লাটে ওঠার উপক্রম। আর সেই কারণেই পত্রপত্রিকায় টাকাকড়ি সংক্রান্ত কোনও হেডলাইন দেখলেই ইদানীং তাঁর চোখদুটো চকচক করে ওঠে।

পত্রিকাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখার সময় সামনের আয়নায় প্রতিফলিত নিজের প্রতিবিম্বের দিকেও নজর পড়ল তাঁর। হাজার অভাব-অনটনের মধ্যেও মিঃ বাডের রসবোধে কোনও ভাঁটা পড়েনি। তাই আপনা থেকেই ঠোঁটের ফাঁকে একটুকরো হাসির আভাস উঁকি দিল। সেই নৃশংস খুনেটা সত্যিই যদি তাঁর দোকানে পায়ের ধুলো দেয় তবে এই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি তার কিছুই করতে পারবেন না। তাঁর বয়স এখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ। রোগাটে গড়ন। ফ্যাকাশে কটা চুল। সামনের দিকে পাতলা হতে শুরু করেছে। কিছুটা বংশগত কারণে, আর কিছুটা আর্থিক চিন্তা-ভাবনায়। উচ্চতা মাত্র সাড়ে পাঁচফুট। এবং সমস্ত হেয়ার-ড্রেসারের মতো দুহাতের তালু খুবই নরম।

এই চেহারা নিয়ে তিনি কিছুতেই ছ'ফুটের বেশি লম্বা শক্তিশালী উইলিয়ম স্ট্রিকল্যান্ডের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন না। এমন কী হাতে একটা ক্ষুর থাকলেও সফল হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। স্ট্রিকল্যান্ড লোকটা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনই নিষ্ঠুর। ও ওর বৃদ্ধা কাকিকে মাথায় ভারী মুগুর মেরে খুন করেছে। তারপর মৃতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো বড় ছুরির সাহায্যে টুকরো টুকরো করে তাপচুল্লির মধ্যে ঢুকিয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার ধান্দায় ছিল। তখনই পুলিশ কোত্থেকে খবর পেয়ে সদলবলে বৃদ্ধার বাড়িতে এসে হানা দেয়। স্ট্রিকল্যান্ডও সেই থেকে ফেরার। সন্দিগ্ধ চিত্তে মাথা নাড়লেন মিঃ বাড। নাঃ, তাঁর একার পক্ষে এমন একটা নর-দানবের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। খানিকটা হতাশ ভঙ্গিতেই তিনি এবার সেলুনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সামনের দোকানে খরিদ্দারের কেমন গাদি লেগেছে উঁকি মেরে সেটাই শুধু একবার দেখতে চান তিনি। কিন্তু দরজার ঠিক মুখেই দশাসই চেহারার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগল। প্রায়ই দৌড়েই মিঃ বাডের দোকানে ঢুকছিলেন আগন্তুক।

—ক্ষমা করবেন, স্যার! আমি ঠিক দেখতে পাইনি। —কাঁচুমাচু-মুখে নিবেদন করলেন মিঃ বাড। পাছে আগন্তুক রেগেমেগে তাঁর দোকান ছেড়ে চলে যান, এবং তাঁর ন-পেন্স রোজগার হাতছাড়া হয়ে যায়, সেই আশঙ্কাতেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। —একটু টাটকা হাওয়ার জন্যে বাইর গিয়ে দাঁড়াব ভেবেছিলাম। ... আপনি কি স্যার, শেভ করবেন ?

দশাসই চেহারার ভদ্রলোক বাডের এই বিগলিত হাত-কচলানো ভঙ্গি গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। ক্ষিপ্র হাতে ওভারকোটের বোতাম খুলতে খুলতে রূঢ় কণ্ঠে ইংরিজিতে প্রশ্ন করলেন —তুমি কি মরার জন্যে প্রস্তুত ?

প্রশ্ন শুনে বাডের অন্তত সেইরকমই মনে হল। এইমাত্র হতভাগ্য বৃদ্ধার খুনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন বাড। আগন্তুকের প্রশ্নের সঙ্গে নিজের মানসিক চিন্তাধারার অদ্ভুত সামঞ্জস্য লক্ষ করে তিনি খানিকটা চমকিয়ে গেলেন প্রথমে। —মাপ করবেন, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন... ?

—তোতলাতে তোতলাতে মাঝ পথে থেমে গেলেন তিনি। এখন তাঁর মনে হল আগন্তুক হয়তো কোনও ধর্মপ্রচারক বা ওই জাতীয় কিছু হবেন। দেখতে শুনতেও অনেকটা সেইরকম। অদ্ভুত ধরনের হালকা বাদামী চোখ এক মাথা লাল চুল, থুঁতনির নীচে ছোট করে ছাঁটা এক চিলতে দাড়ি। মিঃ বাডের মনে হল ভদ্রলোক হয়তো মঠ-নির্মাণ বা ওই জাতীয় কোনও ধর্মীয় কারণে শেষমেষ তাঁর কাছ থেকে চাঁদা চেয়ে বসবেন। ব্যাপারটা তা হলে খুবই বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়াবে। কেননা ইতিমধ্যেই ভদ্রলোককে ন-পেন্সের একজন খদ্দের হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন তিনি। তার সঙ্গে তিনপেন্স বকশিস মিলিয়ে পুরো এক শিলিংও দাঁড়াতে পারত সেটা।

—তোমার সেলুনে কি কলপের ব্যবস্থা আছে। —অসহিষ্ণু গলায় আবার প্রশ্ন করলেন আগন্তুক।

এতক্ষণে হুঁশ ফিরল বাডের। 'ডাই' মানে শুধু যে মরা নয় চুলের কলপও বোঝায় সেটা তাঁর মগজে ঢুকল। এবং ভদ্রলোক সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন তাঁকে।

—ওহ্, হ্যাঁ স্যার। —বাডের বুক ঠেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস উঠে এল। —নিশ্চয় ... নিশ্চয়, কলপের সব ব্যবস্থাই আমার তৈরি আছে।

একেই বলতে হয় ভাগ্য! কলপ মানে একগাদা পয়সা। সাড়ে সাত শিলিং। কোথায় ন-পেন্স আর কোথায় সাড়ে সাত শিলিং!

—তা হলে তো খুবই ভাল! —একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে মন্তব্য করলেন আগন্তুক। ইতিমধ্যে মিঃ বাড তাঁর মক্কেলের ঘাড় বেষ্টন করে একটা শাদা চাদর জড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। এই মুহূর্তে সামনের সেলুনটার দিকে ট্যারা চোখে তাকিয়ে দেখার তাঁর কোনও প্রয়োজন নেই। —ঘটনাটা হচ্ছে —আগন্তুক বললেন —লাল রঙের এই চুল আমার বান্ধবীর মোটেই পছন্দ নয়। ওর ধারণা এই রংটা নাকি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওর সমবয়সী বন্ধুরা এই নিয়ে প্রায়ই ওকে খোঁটা দেয়। এদিকে আমার বান্ধবী বয়সে আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোট। তাই ওর সব আবদারই আমাকে মেনে চলতে হয়। সেইজন্যে ঠিক করলাম এমনভাবে চুলের রং করব যাতে সহজে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। তাই গাঢ় বাদামী রংটাই আমি পছন্দ করলাম। এই রংটা ওর-ও খুব পছন্দ। এ-ব্যাপারে তোমার কী মত ?

বাডের মনে হল ভদ্রলোকের বান্ধবীর মনের ভাবগতিক বাস্তবিকই ভারী অদ্ভুত। কারণ গাঢ় বাদামী রঙের চেয়ে বর্তমানের এই ফিকে লাল রংটা অনেক বেশি দৃষ্টিনন্দন। কিন্তু ব্যবসার খাতিরেই ভদ্রলোকের কথায় সায় দিতে হল তাঁকে। তা ছাড়া তাঁর এমন মনে হল যে বান্ধবীর গপ্পোটা হয়তো পুরোপুরি ভাঁওতা। আদতে কোনও বান্ধবী-ই নেই ভদ্রলোকের। কারণ বাড বেশ ভাল করেই জানেন, কোনও তরুণী কেবলমাত্র চেহারার মধ্যে খানিকটা পরিবর্তন

জানার অভিপ্রায়ে তার চুলের রং বদলের কথা ভাবতে পারে। অথবা তার মনে এমন একটা ধারণা জন্মাতে পারে যে বিশেষ কোনও রং তার সৌন্দর্যের পক্ষে আরও বেশি মানানসই হবে। কিন্তু কোনও পুরুষমানুষ যখন তার চুলের রং বদলাতে চায় তখন বুঝতে হবে এর পেছনে তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সম্ভব হলে নিজের কৃতকর্মের কোনও দায়িত্ব সে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়।

—তাহলে এবার তুমি কাজে লেগে পড়ো। —বাডকে নির্দেশ দিলেন তিনি। —হ্যাঁ, ভাল কথা। দাড়িটাকেও একবারে সাফ করে দিতে হবে। আমার বান্ধবী এই দাড়িটাও বরদাস্ত করতে পারছে না।

—আজকাল অধিকাংশ তরুণী-ই দাড়িটাড়ি পছন্দ করে না, স্যার। —ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালেন বাড। —আগেকার দিনে এই দাড়ির কত কদর ছিল! কত রকমের বাহার ছিল দাড়ির। দাড়ি দেখেই প্রেমে পড়ত কত সুন্দরী। তবে সেদিক থেকে আপনাকে স্যার, খুবই ভাগ্যবান বলতে হবে। আপনার থুঁতনির গড়ন এত সুন্দর যে বিনা দাড়িতেও দিব্যি মানিয়ে যাবে আপনাকে।

—সেই রকমই মনে হচ্ছে না কি তোমার ? —উদ্বিগ্নচিত্তে আয়নায় প্রতিফলিত নিজের প্রতিবিম্ব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে করতে মন্তব্য করলেন ভদ্রলোক। —তোমার কথা শুনে বেশ খুশিই হলাম।

—আপনি কি স্যার, আপনার গোঁফটাও একইসঙ্গে কামিয়ে নেবেন ?

—গোঁফ! আরে .. না ... না! নাকের নীচে এই গোঁফজোড়াটা বজায় রাখার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব। মানে আমার বান্ধবী যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছে ...

কথার মাঝখানেই ঝকঝকে শাদা দাঁত বের করে সশব্দে হেসে উঠলেন আগন্তুক। মজবুত দাঁতের গড়ন দেখে সন্তুষ্ট হলেন মিঃ বাড। ভদ্রলোকের ওপর পাটির সোনা-বাঁধানো দাঁতটাও বাডের নজরে পড়ল। বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোকের অবস্থা বেশ সচ্ছল। নিজেকে পরিপাটি ছিমছাম দেখানোর জন্যে দু-চার পয়সা বেশি খরচ করতেও বিশেষ কার্পণ্য করবেন বলে মনে হয় না।

মিঃ বাডের এই নতুন মক্কেলটি নিশ্চয় তাঁর চেনা-পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কাছে এই সেলুনটার প্রশংসা করবেন। মনে মনে কল্পনা করলেন বাড। এখানে আসার জন্যে পরামর্শ দেবেন তাঁদের। তাঁকে এখন খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। তাঁর কাজের মধ্যে কোথাও যেন সামান্য কোনও খুঁত না থাকে। তা ছাড়া চুলের রং বস্তুটাই খুব বদখত প্রকৃতির। প্রায়ই এর মধ্যে এমন সব ক্ষতিকারক পদার্থের মিশ্রণ ঘটানো হয়, চামড়ার পক্ষে যা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। কিছুদিন আগে এ-ব্যাপারে একটা মামলাও হয়ে গেছে আদালতে। কাগজেও ফলাও করে সে খবর বেরিয়েছিল।

—আপনি কি ইতিপূর্বে শাদাটে রঙের কোনও কলপ ব্যবহার করেছিলেন? —বিনীত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বাড। —মানে, কোন কোম্পানির কলপ যদি জানতে পারতাম ...

—ও ... হ্যাঁ, আসল ব্যাপারটা কী জান, —একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আগন্তুক বললেন—আমার বান্ধবী যে বয়সে আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোট তা তো তোমাকে আগেই বলেছি। এদিকে অকালে আমার মাথার চুলে পাক ধরতে শুরু করল। এ রোগটা অবশ্য আমাদের বংশগত। আমার বাবারও সব চুল অকালে পেকে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম কোনও রঙের সাহায্যে পাকা মাথাটা একটু মেরামত করে নিই। কিন্তু রংটা আমার বান্ধবীর ঠিক মনপুত হল না। অবশেষে চিন্তা করে দেখলাম কলপই যদি লাগাতে হয় তবে বান্ধবীর পছন্দমতো রংই ব্যবহার করা ভাল। কি, ঠিক বলিনি?

সাধারণ লোকের ধারণা পরামানিকেরা স্বভাবতই বাক্যবাগীশ হয়। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে আদালতে তারা খুব চালাক-চতুর। পাঁচরকম কথাবার্তার মাধ্যমে তারা তাদের মক্কেলদের অনেক গোপন কথা জেনে নেয়। এমন কী মক্কেলরা কখন মিথ্যে বলছে তাও তারা বুঝতে পারে। তবে সরলতা-বশত পাছে মুখ ফসকে কোনও অপ্রিয় সত্য কথা বেরিয়ে আসে তাই বাড আলোচনার মোড়টাকে স্থানীয় আবহাওয়া আর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে ঘুরিয় দিলেন।

তরুণীদের খামখেয়ালী মনের কথা ভাবতে ভাবতে মিঃ বাড আগন্তুকের এক গোছা চুল হাতে ধরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ল এই মক্কেলটির মাথার চুলের স্বাভাবিক রং কোনওদিনই লাল ছিল না। এর আদত রং ছিল কালো, এবং এই কালো চুলই পেকে গিয়ে রুপোলি বর্ণ ধারণ করেছিল। বাডের যদিও এতে কিছু যায়-আসে না। ভদ্রলোক আগে কোন ব্রান্ডের কলপ ব্যবহার করেছিলেন এটাই ছিল শুধু তাঁর জ্ঞাতব্য বিষয়। কারণ অনেক সময় এক ব্র্যান্ডের কলপের সঙ্গে অন্য ব্র্যান্ডের কলপ ঠিকমতো খাপ খায় না। তাই এ-ব্যাপারে তাঁকে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

গল্পগুজবের ফাঁকে ফাঁকেই বাড তাঁর খরিদ্দারের দাড়ি পরিষ্কারভাবে কামিয়ে দিলেন। মাথাটাও শ্যাম্পু করলেন অনেকক্ষণ ধরে। চুলে কলপ লাগাবার আগে এই শ্যাম্পুটা খুবই জরুরি। তারপর বিদ্যুত-চালিত ড্রায়ারের সাহায্যে গরম বাতাস দিয়ে শুকনো করতে লাগলেন ভিজে চুলগুলো। কথাবার্তাও চলতে লাগল সমান তালে। উইম্বলডনের টেনিস থেকে শুরু করে সরকারের বর্তমান কর-নীতি কিছুই বাদ গেল না। অবশেষে অনিবার্যভাবে ম্যাঞ্চেস্টারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গটাও এসে পড়ল।

—ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, খুনিকে পাকড়াওয়ের আশা পুলিশ একবারে ছেড়েই দিয়েছে।

—মন্তব্য করলেন আগন্তুক।

—তবে নতুন করে যে পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার ফলে কেউ কেউ হয়তো উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে। —বাড বললেন। কারণ বর্তমানে এই চিন্তাটাই তাঁর সারা মন জুড়ে ছিল।

—খুনিকে ধরে দিতে পারলে পুরস্কারও দেওয়া হবে নাকি ? ঘোষণাটা অবশ্য এখনও আমার নজরে পড়েনি।

—হ্যাঁ, এই তো। আজকের সন্ধের কাগজেই খবরটা বেরিয়েছে। আপনি নিজেই পড়ে দেখুন না। —চলন্ত ড্রয়ারটা এক হুকে ঝুলিয়ে রেখে মিঃ বাড ইভনিং মেসেঞ্জার পত্রিকাটা আগন্তুকের দিকে এগিয়ে দিলেন। নির্দিষ্ট জায়গাটা বেশ মনযোগ সহকারেই পড়তে লাগলেন ভদ্রলোক। নিজের কাজ করতে-করতে আয়নার মধ্যে দিয়েই তাঁকে লক্ষ করছিলেন বাড। আগুন্তুকের বাঁ হাতটা এতক্ষণ চেয়ারের হাতলের ওপর আলগা হয়ে পড়েছিল। ভদ্রলোক হঠাৎ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাতটা চাদরের ভেতর টেনে নিলেন।

তবে একটা জিনিস ইতিমধ্যে বাডের নজরে পড়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোকের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখটা ভেঙে শক্ত হয়ে গেছে। অনেক মানুষেরই কোনও একটা আঙুল এমনভাবে বিকৃত হয়ে যেতে পারে, মনে মনে চিন্তা করলেন বাড। তাঁর বন্ধু বার্ট ওয়েবারের ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখটা এক মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায় বিশ্রীরকম থেঁতলে গিয়েছিল। ওয়েবারের ওই নখটা এইরকমই দেখতে।

ভদ্রলোক এবার চোখ তুলে বাডের মুখের দিকে তাকালেন। সে-দুটো চোখ যেন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে চাইছে বাডকে। তার মধ্যে তীব্র একটা শাসানির ভাবও মিশেছিল।

—ইতিমধ্যে খুনেটা নিশ্চয় দেশের বাইরে সরে পড়েছে। —অকপটেই মনের কথা ব্যক্ত করলেন বাড। —আমার অন্তত তাই ধারণা। বিজ্ঞাপনটা দিতে ওরা অনেক দেরি করে ফেলেছে।

আগন্তুক হেসে উঠলেন শব্দ করে। —আমারও তাই বিশ্বাস।

মিঃ বাড নিজের মনে চিন্তা করলেন, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখটা থেঁতলানো। এবং সেইসঙ্গে বাঁ দিকের ওপর পার্টির শেষ দাঁতটা সোনা দিয়ে বাঁধানো। সারা লন্ডন শহরে এমন কজন লোকই বা আছে! কয়েক-শ হবে নিশ্চয়। তার ওপর চুলের রং রুপালি, সেটা অবশ্য কলপের সুবাদেও হতে পারে। তবে বয়সটা কিন্তু তেতাল্লিশের কাছ বরাবর।

ড্রায়ারের সুইচটা অফ করে বাড সেটা হুকে ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর অন্যমনস্ক হাতে চিরুনি বোলাতে শুরু করলেন আগন্তুকের চুলের মধ্যে। না, এই চুলের আসল রং কোনওদিনই আগুনের মতো লাল ছিল না।

ম্যাঞ্চেস্টারের ওই নিহত বৃদ্ধার দেহে কতগুলো নৃশংস আঘাতের চিহ্ন ছিল সে সংখ্যাটাও নিখুঁতভাবে মিঃ বাডের হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ভদ্রমহিলা বৃদ্ধা হলেও কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ ছিলেন। সেলুনের দরজাটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন বাড। তাঁর মক্কেল এমনভাবে পথ জুড়ে বসে আছেন যে তাঁকে না ডিঙিয়ে দরজার কাছে পৌঁছনোর কোনও উপায় নেই। সামনের রাস্তা দিয়ে কতলোকই না যাতায়াত করছে! লোকটাকে পাকড়াও করা এখন কতই সহজ। কিন্তু ...

—একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাও হে! —আগন্তুকের কণ্ঠে চাপা অধর্যের সুর। —আমার অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের পরেও তোমাকে কাজ করতে হলে আমাকে হয়তো শেষপর্যন্ত ওভারটাইমের টাকাও গুণতে হতে পারে।

—না ... না, স্যা! —ব্যস্ত গলায় বাড বললেন —এ নিয়ে আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না!

বাড যদি এখন দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করেন, তা হলে এই ভয়ঙ্কর মক্কেলটি তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে গলাটা টিপে ধরবেন। তাঁর গলা দিয়ে কোনও শব্দই বের করতে দেবেন না। তার আগেই দম-বন্ধ হয়ে মারা যাবেন বাড। কিংবা জোরালো একটা ঘুষিতে তাঁর মাথার খুলিটাও গুঁড়িয়ে দিতে পারেন। কাকির মাথাটা তিনি এইভাবেই গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তবে মিঃ বাড এখন অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন। তাঁকে খুন করা শয়তানটার পক্ষে খুব একটা সহজ হবে না। কারণ বাইরের রাস্তা দিয়ে বিস্তর লোকজন চলাফেরা করছে। লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই তাঁকে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছতে হবে। খানিকটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই বাড এবার পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

—তোমার ব্যাপারটা কী ? —ধমকের সুরে প্রশ্ন করলেন মক্কেল।

—আমি শুধু স্যার, দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সময়টা জেনে নিতে চাইছি। —সন্ত্রস্ত গলায় জবাব দিলেন বাড।

এমন কী বুকে সাহস থাকলে বাড হয়তো দরজার কাছে ছুটে চলে যেতে পারতেন, তা হলে এই খেলা এখানেই শেষ হত, কিন্তু সাহসের অভাবেই তিনি তা করতে পারলেন না।

—এখন পাঁচটা বেজে আটাশ। —গম্ভীর গলায় তিনি বললেন। —তোমাকে আর সময় জানতে বাইরে বেরুতে হবে না। বাড়তি খাটুনির জন্যে তোমার যা পাওনা হয় আমি মিটিয়ে দেব।

—না... স্যার, বাড়তি পয়সার জন্যে আমি মোটেই ব্যস্ত হয়ে উঠিনি। ... মোলায়েম ভঙ্গিতে বাড জানালেন। যদিও মনে মনে বুঝলেন অনেক দেরি করে ফেলেছেন। এখন আর তাঁর পক্ষে নতুন করে কোনও চেষ্টা চালানো সম্ভব নয়।

তা হলে খুনেটা তাঁর মাথার খুলি ফাটিয়ে দিয়ে সরে পড়বে। শাদা চাদরের আড়ালে লুকনো হাতের মধ্যে পিস্তলও ধরা থাকতে পারে।

মিঃ বাড এবার কলপের সাজসরঞ্জামগুলো নিয়ে আসার জন্যে দোকানের পিছন দিকের ছোট দেওয়াল-আলমারির পাল্লা খুললেন। কেবলমাত্র তিনি যদি একটু বেশি তৎপর হতেন —গোয়েন্দা কাহিনীর ধুরন্ধর নায়কদের মতো তাঁর দৃষ্টিশক্তি যদি আরও স্বচ্ছ হত —তবে অনেক আগেই বুড়ো আঙুলের ভাঙা নক আর সোনা-বাঁধানো দাঁতের মধ্যে নিগুঢ় একটা যোগসূত্র খুঁজে পেতেন। খুনেটার মাথার চুল যখন সাবান দিয়ে শ্যাম্পু করছিলেন তখন তার মুখটা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা ছিল। সেই সময় অনায়াসে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে লোকজন জড় করে ফেলতে পারতেন। শয়তানটার চোখে সাবানের ফেনা ছিটিয়ে তাকে কাবু করে ফেলাটাও খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। সেই অবস্থায় কারুর পক্ষে খুন করা বা রাস্তা দিয়ে ছুটে পালানো আদৌ সম্ভব হত না।

তা সত্ত্বেও, আলমারি থেকে একটা বোতল টেনে নিয়ে সেলফের ওপর রাখতে মনে মনে চিন্তা করলেন বাড, খুব কি একটা দেরি হয়ে গেছে ? তিনি কি এখনও একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন না ? শক্ত মুঠোয় একটা ক্ষুর বাগিয়ে ধরে নিঃশব্দে খুনেটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াবেন। তারপর কঠিন গলায় বলবেন, এবার তোমার খেল খতম, উইলিয়াম স্ট্রিকল্যান্ড! তোমার বাঁচা-মরা এখন আমার মর্জির ওপর নির্ভর করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমার পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিই, ততক্ষ দুই-হাত ওপরে তুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। আমি তোমাকে নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে সঁপে দেব। ইতিমধ্যে কোনওরকম চালাকির চেষ্টা করো না। বর্তমান পরিস্থিতিতে শার্লক হোমস নিশ্চয় তাই-ই করতেন।

কিন্তু কলপের সাজসরঞ্জামগুলো একটা ট্রে-র ওপর চাপিয়ে আগন্তুকের কাছে নিয়ে আসতে আসতেই মিঃ বাডের বুকটা আবার চুপসে গেল। নামীদামি গোয়েন্দাদের মতো কর্মতৎপরতা যে তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, সেটাও তিনি বুঝতে পারলেন মনে মনে। এমন কী সে-রকম কোনও প্রচেষ্টাও শেষকালে খুবই হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে। তিনি যদি সত্যিই একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে শয়তানটার পেছনে গিয়ে বলেন, দু-হাত ওপরে তুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো তো বাছাধন, তা হলে খুনেটাই ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত থেকে জোর করে ক্ষুরটা কেড়ে নেবে। বাডের ধারণামতো সত্যিই যদি লোকটা নিরস্ত্র হয়, তবে সেই নিরস্ত্র খুনির হাতে একটা শাণিত ক্ষুর তুলে দেয়ো মাটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

কিংবা বাড হয়তো ক্ষুর উঁচিয়ে জোরের সঙ্গে বললেন, তোমার হাত দুটো ওপরে তোলো, আর লোকটা গোঁয়ারের মতো জবাব দিল, না ... তুলব না, তখন ? তিনি কি ক্ষুর দিয়ে লোকটার গলা কাটবেন ? সেটা তো খুনেরই সামিল হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য বাডের পক্ষে এমন একটা দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত

হওয়া সম্ভব কি না, সে-বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ আছে। পরের দিন সকালে ছোকরা চাকরটা দোকান সাফ করতে না-আসা পর্যন্ত তিনি নিশ্চয় খুনেটাকে নিয়ে সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না।

দোকানে আলো জ্বলতে দেখলে রাতের টহলদার পুলিশ-কর্মচারী হয়তো দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখবে। এবং এমন একজন ভয়ঙ্কর খুনেকে ধরে দেবার জন্যে তারা নিশ্চয় অভিনন্দনও জানাবে বাডকে। কিন্তু ঘটনাটা যদি দৈবাৎ সেই টহলদারের নজর এড়িয়ে যায়! তখন তো মিঃ বাডকে রাতভর এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তিনি নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, অন্যমনস্ক হয়ে যাবেন, আর তখন ... ?

কাগজের বয়ান অনুযায়ী মিঃ বাডকে অবশ্য অপরাধীকে গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে অপরাধী সম্পর্কে এমন কোনও সুনিশ্চিত খবর দিতে হবে যাতে করে পুলিশের পক্ষে অপরাধীর হদিশ পাওয়া সম্ভব হয়। তিনি পুলিশকে বলতে পারেন, পলাতক ব্যক্তি তাঁর দোকানে এসেছিল। তার চুলের রং এখন গাঢ় বাদামী। দাড়ি নেই, তবে গোঁফটা বজায় আছে। এমন কী খুনেটা দোকান থেকে বেরুবার পর তিনি পেছন-পেছন তাকে অনুসরণও করতে পারে।

ঠিক এই মুহূর্তে বাড যেন বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক প্রেরণা পেলেন। সামনের তাক থেকে একটা বোতল টেনে নামাতে নামাতে ছোটবেলায় একটা স্মৃতি পরিষ্কারভাবে তাঁর মনে পড়ে গেল। সাবেক আমলের কাঠের তৈরি একটা কাগজ-কাটা ছুরি ছিল তাঁর মায়ের। সেই ছুরির হাতলটা ছিল বসন্তের রানী নীল রঙের ফরগেট-মি-নট ফুলের আদলে তৈরি। তার একদিকে খোদাই করা ছিল একটা মহৎবাণী, জ্ঞান-ই শক্তির উৎস।

নতুন করে আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল মিঃ বাডের বুকে। তাঁর মনটাও এখন অতিমাত্রায় সতর্ক। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই তিনি ক্ষুরটা মুড়ে বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রাখলেন। তারপর নানারকম কথাবার্তার ফাঁকে-ফাঁকেই দক্ষ হাত গাঢ় বাদামী রঙের কলপ লাগিয়ে চললেন আগন্তুকের চুলে।

তাঁর এই নতুন খদ্দেরটি যখন দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তখন রাস্তার লোকজনের সংখ্যা আগের তুলনা অনেক কমে এসেছে। বাড লক্ষ করলেন গ্রসভেনর প্লেস পেরিয়ে গিয়ে একটা চব্বিশ নম্বর বাসে উঠে বসলেন আগন্তুক।

এটা শুধু একটা চালাকি, মাথায় টুপি আর গায়ে কোট চাপিয়ে আলো নিভিয়ে দোকান বন্ধ করতে করতে বাড ভাবলেন, ভিক্টোরিয়ায় নেমে ভদ্রলোক নিশ্চয় আবার চার্নিং ক্রস বা ওয়াটারলুর বাস ধরবেন।

দোকানের দরজা বন্ধ করে প্রাত্যহিক অভ্যাসমতো লক্‌টাও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন মিঃ বাড, তারপর ধীরেসুস্থে চব্বিশ নম্বর বাস স্টপেজের দিকেই গেলেন। তাঁর গন্তব্যস্থলে অবশ্য হোয়াইট হল পর্যন্ত।

বাড যখন কোনও উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন, তখন থানার দ্বাররক্ষী প্রথমে তাঁকে বিশেষ একটা পাত্তা দিতে চায়নি। কিন্তু যখন জানালেন যে ম্যাঞ্চেস্টার হত্যাকাণ্ডের অপরাধী সম্পর্কে তিনি কিছু খোঁজখবর দিতে এসেছেন, এবং ব্যাপারটা খুবই জরুরি, তখন পাহারাদার তাঁকে ভেতরে যাবার অনুমতি দিল।

প্রথমে পুরোদস্তুর পুলিশি উর্দি-পরা জাঁদরেল চেহারার এক ইন্সপেক্টরের মুখোমুখি হতে হল বাডকে। তিনি বেশ শান্তভাবেই বাডের কাহিনীটা আগাগোড়া শুনে গেলেন। সোনা-বাঁধানো দাঁত, থেঁতলানো নখ আর চুলের রং সম্পর্কেও খুঁটিয়ে জেরা করলেন তিনি। অবশেষে বেল বাজিয়ে এক কনস্টেবলকে ডেকে পাঠালেন। কনস্টেবল ভেতরে ঢুকলে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—পারকিনস, এই ভদ্রলোককে তুমি এক্ষুণি স্যার অ্যানড্রু কাছে নিয়ে যাও।

স্যার অ্যানড্রুকে একজন বিজ্ঞ-বিচক্ষণ এবং অমায়িক ব্যক্তি বলেই মনে হল মিঃ বাডের। তিনি খুব মনযোগ সহকারেই সমস্ত ব্যাপারটা শুনলেন। আর একজন ইনসপেক্টরকে ডেকেও সবটা শোনালেন। পরিশেষে মাথা নাড়লেন ধীরে ধীরে'। —হ্যাঁ, আপনার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, এই হচ্ছে আমাদের ফেরারী আসামী উইলিয়াম স্ট্রিকল্যান্ড।

—আমার আরও একটা কথা আছে, স্যার,—আমতা আমতা করে বাড বললেন —আমিও ভদ্রলোককে খুনের আসামী হিসেবেই ধরে নিয়েছিলাম। যদি আমার হিসেবে কোনওরকম ভুলচুক হয়ে থাকে তা হলে আমি একবারে ধনেপ্রাণে মারা পড়ব। আমার ব্যবসাপত্তর সব লাটে উঠবে। ...

তাঁর দোকানের নতুন এই খদ্দেরটির সঙ্গে তিনি যে ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়েছেন, যা তাঁর পেশার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত, এবং যেটাকে পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকতাই বলা চলে, সে কাহিনীটাও খুলে বললেন সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে।

অস্টেন্ড-গামী মিরান্দা জাহাজের ওয়্যারলেস অপারেটর লন্ডনের পুলিশ হেড-কোয়ার্টার থেকে পাঠানো বিশেষ বেতার-বার্তাটা দ্রুত হাতে নিজের প্যাডে নোট করে নিল।

এক্ষুণি এটা ক্যাপটেনের হাতে পৌঁছে দেওয়া উচিত। মনে মনে চিন্তা করল সে। বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন এই খবরে কীরকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবেন যে-কথা ভেবে তার দুঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস উঁকি দিল।

বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন খবরটা পাওয়া মাত্রই বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বেল বাজিয়ে স্টিউয়ার্ডকে ডেকে পাঠালেন। স্টিউয়ার্ড তাঁর অধীনস্থ কর্মচারিদের কাছে বেতার-বার্তার সারমর্মটা বুঝিয়ে দিলেন ভাল করে।

ইংলিশ চ্যানেল, নর্থ-সী, মার্সেই বন্দর, এমন কী অ্যাটলান্টিকের বুকে ভাসমান প্রতিটি জাহাজ, স্টিমার, বিলাস-বহুল প্রমোদ তরী, ডেস্ট্রয়ার—যেখানে

যেখানে ওয়্যারলেসের ব্যবস্থা আছে, তাদের প্রত্যেকের ক্যাপ্টেনের কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল খবরটা। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক এবং নরওয়ের প্রতিটি বন্দরের পুলিশ-কর্তৃপক্ষই এ-সম্পর্কে ওয়াকিবহার ছিল। ক্রয়ডনের দুজন বয়-স্কাউট নিজেদের তৈরি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে টেলিগ্রাফে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের সঙ্কেত লিপির পাঠোদ্ধারের অভ্যাস করছিল। লন্ডন পুলিশের এই সঙ্কেত বার্তাটাও তারা তাদের নোটবুকে বিস্তারিত ভাবে লিখে রাখল।

—ওহ্ ক্রাইস্ট, কী মজার একটা ব্যাপার! —জর্জের দিকে মুখ তুলে জিম বলল। —তোর কি মনে হয় এর সুবাদে আসল লোকটাকে ওরা খুঁজে বের করতে পারবে।

সকাল সাতটায় মিরান্দা জাহাজটা অস্টেন্ডের বন্দরে এসে ভিড়ল। একজন খালাসি ছুটতে ছুটতে ওয়্যঅরলেস অপারেটরের কেবিনে এসে ঢুকল। অপারেটর তখন সবেমাত্র কান থেকে হেড ফোনটা খুলে রাখতে যাচ্ছিল।— একটা জরুরি খবর আছে। এটা এক্ষুণি জায়গামতো পৌঁছে দিতে হবে। —হাঁপাতে হাঁপতে লোকটা বলল। —ওপরে যেন কী একটা ব্যাপার ঘটেছে! বন্দরের পুলিশ-কর্তৃপক্ষের কাছেও খবর পাঠিয়েছেন ক্যাপ্টেন। তাঁরা এখনই সদলবলে এখানে আসছেন বলে জানিয়েছেন। ওয়্যারলেস অপারেটর আবার ব্যাজার মুখে সুইচ টিপে লাইন চালু করল।

—লন্ডন পুলিশ-কর্তৃপক্ষের জন্যে বিশেষ একটা খবর আছে। বর্ণনা-মাফিক একজন প্যাসেঞ্জারের সন্ধান পাওয়া গেছে এখানে। ওয়াটসন নাম দিয়ে তিনি টিকিট বুক করেছিলেন। ভদ্রলোক এখন দরজা বন্ধ করে নিজের কেবিনে বসে আছে। কিছুতেই বাইরে বেরুতে রাজি হচ্ছেন না। শুধু একজন হেয়ার-ড্রেসারকে তাঁর কেবিনে পাঠিয়ে দিতে বলছেন। অস্টেন্ড বন্দরের পুলিশ-দপ্তরে খবর পাঠানো হয়েছে। আমাদের ক্যাপ্টেন তাঁদের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

মিরান্দা জাহাজের প্রথম শ্রেণীর ছত্রিশ নম্বর কেবিনের সামনে একটা জটলার সৃষ্টি হয়েছিল। ভেতরে কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে বলে আঁচ করেছিল অনেকে। বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এসে পরিস্থিতির হাল ধরলেন। তিনি জোর করে সকলকে সরিয়ে দিলেন সেখান থেকে। কোনওরকম হই-হট্টগোল করতেও নিষেধ করে দিলেন সবাইকে। শুধু জনা চার-পাঁচ বিশ্বস্ত নাবিক এখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। বাইরের গোলমাল থেমে যাওয়াতে ছত্রিশ নম্বর কেবিনের যাত্রীর পায়ের শব্দ এখন পরিষ্কার শুনতে পাওয়া গেল। ভদ্রলোক যেন অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অপরিসর কেবিনটার মধ্যে। জিনিসপত্তর সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছত্রাকার করছেন। জলের ঝাপটা দেবার আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল থেকে থেকে।

অবশেষে জনৈক কর্মচারী এসে ক্যাপ্টেনের কানে কানে কী একটা খবর দিল। ক্যাপ্টেন সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। কিছু বাদে ছ'জন শক্তসমর্থ বেলজিয়ান পুলিশ নিঃশব্দে ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়াল। তারা একটা সরকারি নির্দেশনামাও দেখাল ক্যাপ্টেনকে। দেখে শুনে সন্তুষ্ট চিত্তে আবার ঘাড় দোলালেন তিনি।

—তা হলে আপনারা প্রস্তুত ?

—হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনি এগোন।

ক্যাপ্টেন এগিয়ে গিয়ে ছত্রিশ নম্বর কেবিনের দরজায় টোকা মারলেন।

—কে ? —ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন যাত্রীটি।

—আপনি একজন হেয়ার-ড্রেসারের কথা বলছিলেন। আমি স্যার, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

—ওঃ। —স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন বন্ধ-কেবিনের যাত্রী। —দয়া করে তাকে একা পাঠিয়ে দিন। আমার ... আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

—ঠিক আছে স্যার, আমি তাকে একাই পাঠাচ্ছি।

খুব সন্তর্পণে কেবিনের হুড়কো খোলার শব্দ হল। ক্যাপ্টেন এগিয়ে এসে একবারে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দরজাটা এক চিলতের মতো ফাঁক হল। সঙ্গে সঙ্গে আবার পাল্লাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন তাঁর বুট-সুদ্ধ একটা পা দরজার ফাঁকে আটকে দিয়েছেন। জোর করে দরজা ঠেলে জনাকয়েক পুলিশও এবার ভেতরে ঢুকে পড়ল। কেবিনের মধ্যে একটা ধস্তাধস্তি চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হল, বেমক্কা একটা গুলির আওয়াজও শোনা গেল। তবে সৌভাগ্যক্রমে সেটা কারুর গায়ে লাগেনি, জানলার একটা শার্সিই কেবল ভেঙ্গে পড়ল ঝনঝন করে। অবশেষে হাতকড়ি পরিয়ে কেবিনের বাইরে নিয়ে আসা হল বেয়াদব যাত্রীটিকে।

সবুজ! যাত্রীটির সারা মুখমণ্ডলে শুধু সবুজের সমারোহ। সকলে অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করল সেই অদ্ভুত দৃশ্য।

কোন কলপের সঙ্গে কোন কলপ মেশালে তাদের মধ্যে কী ধরনের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটে, এটা মিঃ বাড খুব যত্ন করেই শিখেছিলেন। তাঁর সেই জ্ঞানের সুবাদে তিনি এই নবাগত মক্কেলটিকে এমনভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন যাতে এক কোটি লোকের মধ্যে থেকেও বিশেষ ব্যক্তিটিকে অতি সহজে শনাক্ত করে নেওয়া যায়। সভ্য সমাজে এমন কোনও বন্দর নেই যেখানে একজন খুনি অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্যে নিঃশেষে মিশে যেতে পারে—অথচ যার মাথার সমস্ত চুল, নাকের নীচে সুপুষ্ট গোঁফ জোড়া, এমন কী দুচোখের ভ্রূ পর্যন্ত তোতাপাখির পালকের মতো উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের। রংটা প্রথমে অবশ্য গাঢ় বাদামীই দেখাচ্ছিল, কিন্তু বাতাস লেগে শুকিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেটা

ক্রমে ঘন সবুজ বর্ণ ধারণ করল। বিশেষ দুটো কলপের মিশ্রণে যে এমন একটা ব্যাপার ঘটে সেটা খুব ভালই জানা ছিল মিঃ বাডের।

মিঃ বাড অবশ্য ঘোষিত পুরস্কারের পুরো পাঁচশ পাউন্ডই নগদ পেয়েছিলেন। তা ছাড়া ইডিনিং মেসেঞ্জার তাঁর এই মহৎ বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনীটা ফলাও করে তাদের পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছিল। তারফলে খুবই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন এমন একজন বিশ্বাসঘাতকের দোকানে নিশ্চয় ভুলেও আর কেউ কখনও পা রাখতে সাহস করবে না।

পরেরদিন খুব সকালেই একটা জমকালো লিমুজিন ঠিক তাঁর দোকানের সামনে এসে থামল। উইলটন স্ট্রীটের বাসিন্দাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল সেই গাড়ি দেখে। একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা সেই গাড়ি থেকে নামলেন। তার গায়ে দুর্লভ পশুচর্মের বহুমূল্য কোট। কানে হীরের দুল, গলায় হীরের নেকলেস। গাড়ি থেকে নেমে তিনি সোজা মিঃ বাডের সেলুনে এসে ঢুকলেন।

—আপনি-ই তো মিঃ বাড তাই না—উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। —সুবিখ্যাত মিঃ বাড!

ওঃ ... কী অদ্ভুত কাণ্ডটাই না আপনি করে বসেছেন ? এখন মিঃ বাড, আমাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে। এক্ষুণি আমার চুলগুলো সব সবুজ করে দিন। দেরি করবেন না। কেননা আমার ভীষণ ইচ্ছে, পৃথিবীতে আমি-ই হব এই সবুজ চুলের প্রথম অধীশ্বরী। ও ... হ্যাঁ, আমার পরিচয়টাই এখনও আপনাকে দেওয়া হয়নি। আমি হচ্ছি উইনচেস্টারের ডিউকের পত্নী। আমার মতলবের আঁচ পেয়ে মেলক্যাস্টারের জমিদার গিন্নিও পিছু-পিছু ধাওয়া করে আসছে। আমাকে পেছনে ফেলে ওই প্রথম সবুজ চুলের অধীশ্বরী হতে চায়। হিংসুটি বেড়াল আর কাকে বলে!

আপনাদের মধ্যে যদি কেউ চুলে এই বিশেষ ধরনের সবুজ কলপ লাগাতে চান, তবে আমি আপনাদের মিঃ বাডের বন্ড স্ট্রীটের পারলারের ঠিকানা দিতে পারি। অবশ্য বন্ড স্ট্রীটের সমস্ত দোকানগুলো কেমন জমকালো আর বিলাস-বহুল তা তো আপনারা জানেনই। সেখানে শুধু বনেদী বড়লোকরাই গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার ওপর মিঃ বাডের পারলারে কলপ করতে যাওয়াটা খুবই ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার, যাবার আগে সে কথাটাও দয়া করে স্মরণে রাখবেন।

সে এক রহস্যময়ী

(গেট এ লোড অব দিস)

জেমস হেডলি চেজ

মাঝেমধ্যে পথেঘাটে এমন মেয়েও দৈবাৎ নজরে পড়ে যায় যার দিকে দ্বিতীয়বার চোখ তুলে ফিরে তাকাতে হয়। যেন আপনা থেকেই ঘটে যায় ব্যাপারটা। এর ফলে সময় সময় বিপদ-আপদও ঘটে যেতে পারে। আপনি হয়তো ভিড়ের রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় পথের মাঝে এইরকম কোনও মেয়ের দিকে আপনার চোখ পড়ল। দ্বিতীয়বার তাকে দেখবার জন্যে আপনি ঘাড় ফেরালেন। ঠিক তখনই সেই অসতর্ক মুহূর্তে কোনও পথচারী হয়তো আপনার গাড়ির সামনে পড়ে গেল। অথবা অন্য কোনও দুর্ঘটনা ঘটাও বিচিত্র নয়। এতসব কাণ্ড-কারখানার মূল কারণ কিন্তু চোখ-ঝলসানো সেই মেয়েটি, যে চুম্বকের মতো আপনার দৃষ্টিকে ফিরে ফিরে আকর্ষণ করে।

এই ধরনের একটি মেয়েকেই আমি র‍্যাবেনার কাছে কাজ করতে দেখেছিলাম। ব্রডওয়েতে একটা রেস্তোরাঁ চালাত র‍্যাবেনার। ওর সঙ্গে খানিকটা আলাপ-পরিচয়ও ছিল আমার। তবে লোকটা ছিল খুব তুখড়, একটু বেশি মাত্রায়

তুখড়ই বলা চলে। যদিও ওকে আমি মনেপ্রাণে বিশেষ পছন্দ করতাম না। ওর মুখটা ছিল রুক্ষ, ভাবলেশহীন। এবং আমার কেমন মনে হত, ও নিশ্চয় গোপনে কোনও অসৎ ব্যাপারে লিপ্ত আছে। তা না হলে এমন একটা শাদামাটা রেস্তোরাঁর মালিক হয়ে এত পয়সা কামায় কী করে ? কিন্তু পয়সা যে বেশ ভালরকমই কামায় সেটা তো আর মিথ্যে নয়।

ফ্যাঙ্কুয়িস্ট ওর সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করত। নামটা বেশ অদ্ভুত ধরনের। পরে জেনিছিলাম ওটা মেয়েটার আসল নাম নয়। প্রকৃত নামটা যে কী তাও এখন ভুলে গেছি। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। আমার এই কাহিনীর ক্ষেত্রে নামটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার নয়। তবে একটু আগে যা বলেছিলাম, রেস্তোরাঁয় গেলে হরবকতই মেয়েটার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হত। একটা দৈনিক সংবাদপত্রে সাংবাদিকতার চাকরি করতাম আমি। স্থানীয় সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে নিয়মিত একটা কলম লিখতে হত আমাকে। তার মালমশলা সংগ্রহের জন্যে প্রায় প্রতিদিনই র‍্যাবেনারের রেস্তোরাঁয় গিয়ে হাজির হতাম। কারণ সমাজের যে শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে আমি লিখতাম তাদের অধিকাংশই ওই রেস্তোরাঁয় গিয়ে ভিড় জমাত। মেয়েটা কিন্তু খরিদ্দারের সঙ্গে বেশি একটা মেলামেশা করত না। র‍্যাবেনারের অফিস-ঘরের দিকে যাবার সময়েই শুধু তার দর্শন পাওয়া যেত। তখন সকলেই বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত তার দিকে। এমনই নজরকাড়া রূপ ছিল মেয়েটার।

মেয়েটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ জমাবার ইচ্ছে আমার মগজের মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তবে শুধু আমি একা নই, আরও অনেকেই ছিল আমার দলে। যদিও এই জাতীয় কোনও ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্রয় দেবার কোনও অভিপ্রায় র‍্যাবেনারের ছিল না। একদিন যখন ওকে বললাম যে ফ্যাঙ্কুসিয়েস্টের সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই, ও তখন আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেন আমি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কোনও পোকামাকড়, সবেমাত্র ড্রেনপাইপ থেকে বেরিয়ে এসছি। সেইজন্যে এ-প্রসঙ্গে আমি আর কোনওরকম উচ্চবাচ্য করিনি। এবং পরবর্তী ঘটনাবলী যেদিকে মোড় নিল তাতে করে এ-ব্যাপারে নতুন কোনও উদ্যোগ নেওয়াও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, একদিন সন্ধেয় র‍্যাবেনারকে খুন করল মেয়েটা। খুবই দর্শনীয় খুন। তখন রেস্তোরাঁর মধ্যেই ছিল র‍্যাবেনার। সকলের চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটে গেল। সকলেই শুনতে পেল গুলির আওয়াজ।

কিছুদিন ধরেই র‍্যাবেনার তার রেস্তোরাঁয় খদ্দের বাড়ানোর জন্যে নানারকম চেষ্টা-চরিত্র করছিল। ওর থারণা, খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্যে ও যে-সব ব্যবস্থা চালু রেখেছিল তাতে তারা খুব একটা খুশি হতে পারছে না। অন্যান্য রেস্তোরাঁয় নৈশকালীন আমোদ-প্রমোদের জন্যে আরও অনেক বেশি উদ্যোগ-আয়োজন নেওয়া হয়। তাই সে-সব জায়গায় মাছির মতো সারাক্ষণ খদ্দেরের

ভিড় লেগে থাকে। র‍্যাবেনারের অনুমান মিথ্যে নয়। এমন কী কোন উপায়ে রেস্তোরাঁটাকে আরও বেশি চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায়, সে-সম্পর্কে আমার কাছেও বারকয়েক পরামর্শ করতে এসেছিল। আমি অবশ্য ওকে কোনওরকম পাত্তা দিইনি। কেননা আমার সাহায্য নিয়ে ও নিজের পকেট ভরাক, সেটা আমার কাছে তেমন বাঞ্ছনীয় মনে হয়নি। যা হোক শেষ পর্যন্ত ও নিজেই একটা মতলব বের করল। একদিন হঠাৎ হইহই কাণ্ড বাধিয়ে বসল রেস্তোরাঁর মধ্যে। এ-জাতীয় ঘটনার সঙ্গে অবশ্য আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। সেদিন সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি রেস্তোরাঁর মধ্যে ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার-স্যাপার ঘটে চলেছে। কেউ কারুর বুক লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ছে রিভলবার থেকে, কেউ আবার লম্বা ছুরি চালিয়ে দিচ্ছে কারুর পেটের মধ্যে, কোথাও শুধু ঘুঁষোঘুষি করছে দু'জনে মিলে, মাঝেমধ্যে নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার —সব মিলিয়ে বেশ একটা জমজমাট দৃশ্য। তবে এর পুরোটাই নিছক অভিনয়। ভাড়াটে লোকজনের সাহায্যে মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছে ব্রাবেনার। এর ফলে পানীয়ের বিক্রিও বেশ বেড়ে গেছে হু হু করে। গেলাশে চুমুক দিতে দিতে প্রত্যেকেই তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করছে এইসমস্ত নাটকীয় দৃশ্যাবলী।

এইসময় র‍্যাবেনার এসে টেবিলে-টেবিলে খরিদ্দারদের সঙ্গে হালকা ধরনের দু-চারটে কথাবার্তা বলতে লাগল। অবশ্য ওর রুক্ষ প্রকৃতি ও উদ্ধত স্বভাবের জন্যে ওর মধ্যে কখনও কোনওরকম বিনয়ের ভাব প্রকাশ পেত না। আমরাও ওর এই স্বভাবের বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলাম। তবুও আমাদের জন্যে ও যে মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছে, তার জন্যে ওকে ধন্যবাদ জানাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করলাম না।

আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমি যে টেবিলে বসেছিলাম তার পাশেই দোতলায় অফিসঘরে যাবার সিঁড়ি। র‍্যাবেনার যখন এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঠিক তখনই দোতলার সিঁড়ির মাথায় ফ্যাঙ্কুয়িস্টকে দেখতে পেলাম। আমার আর র‍্যাবেনারের দিকে লক্ষ ছিল না, অপলক দৃষ্টিতে ফ্যাঙ্কুয়িস্টকেই দেখতে লাগলাম আমি। বিশ্বাস করুন, তখন ফ্যাঙ্কুয়িস্ট ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখার ছিল না। সে-ই ছিল সকলের মধ্যমণি। সেইসঙ্গে আরও একটা জিনিস আমার নজরে পড়ল যেটা আপনাদের বলা দরকার। ফ্যাঙ্কুয়িস্টের চোখে-মুখে কেমন এক ধরনের রুক্ষ কাঠিন্য জড়িয়েছিল। যেন বিনা যুদ্ধে একতিলও সে ছাড়তে রাজি নয়। আমার তখন সময়ের খুব টানাটানি, জমিয়ে বসে নাটক দেখার মতো কোনও অবসর নেই। তবুও উঠতে পারলাম না আসন ছেড়ে। আমার এই বেহিসেবী স্বভাবের জন্যে অনেক দুর্ভোগও পোহাতে হয় আমাকে, যদিও এমন চরিত্রের লোক হামেশাই দেখা যায় পৃথিবীতে। এতেই যেন তাদের আনন্দ।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ফ্যাঙ্কুয়িস্ট। তার আয়ত দুই চোখে যেন দু-ঝিনুক হিমশীতল নীল সমুদ্র ধরা আছে। আমার খুব পাশ দিয়েই এগিয়ে গেল সে। দেখলাম তার হাতের মুঠোয় ছোট মাপের একটা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল ধরা রয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম এই নকল খুন-জখমের খেলায় ওর-ও হয়তো ভূমিকা আছে কোনও। কিন্তু তাঁর হাঁটা-চলার ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা আমাকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলল। একবার ভাবলাম তার হাত থেকে পিস্ত লটা কেড়ে নিই। কিন্তু ভাবনাটাকে কাজে পরিণত করতে পারলাম না। আমার মনটা কৌতূহলী হয়ে উঠল। এই মুহূর্তে ও কী করতে যাচ্ছে সে-বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা করলাম। আমার মনে হল আমি হয়তো এমন কোনও সংবাদের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হব যেটা দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতার শিরোনামে স্থান পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ধারণাটা এমনই বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়াল যে সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে দেওয়াল-সংলগ্ন টেবিল থেকে ফোনটা টেনে নিয়ে আমার পত্রিকার সান্ধ্য-সংস্করণের সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

র‍্যাবেনারও এবার ফ্রাঙ্কুয়িস্ট সম্পর্কে পুরোদস্তুর সচেতন হয়ে উঠল। দুজনের মধ্যে তখন দূরত্ব বড়জোর হাত কুড়ি-বাইশ। ফ্যাঙ্কুয়িস্টের চোখের দিকে তাকাতেই সারা মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল র‍্যাবেনারের। আচমকা র‍্যাটল-স্নেক মাড়িয়ে ফেললে মানুষের যে অবস্থা হয় ওর ভাবভঙ্গিও সেইরকম। যেন নিজের মৃত্যুকে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছে। ওর চোখ দুটোও ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। থলথলে হয়ে ঝুলে পড়েছে মুখের চামড়া।

রেস্তোরাঁর সমস্ত খরিদ্দারের দৃষ্টিই এখন ফ্যাঙ্কুয়িস্টের দিকে। তবে একমাত্র আমি ছাড়া আর সকলেই ব্যাপারটাকে নৈশ-নাটকের একটা অংশ হিসেবে ধরে নিয়েছিল বলেই আমার স্থির বিশ্বাস।

ফ্যাঙ্কুয়িস্ট কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে র‍্যাবেনারের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরায়নি। তার হাতে ধরা ক্ষুদ্র পিস্তলটাও ধীরে ধীরে র‍্যাবেনারের কপাল লক্ষ করে স্থির হয়ে রইল। ইতিমধ্যে পত্রিকার সান্ধ্য-সম্পাদক রিসিভার তুলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। আমি তাঁকে এই লোমহর্ষক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারা-বিবরনী দিতে শুরু করলাম। একজন সাংবাদিকের জীবনে এ-জাতীয় সৌভাগ্য খুব কম সময়েই জুটে থাকে।

তীক্ষ্ণ সুরে শিস দেবার মতো একটা শব্দ করে ছুটে গেল বুলেটটা। আমরা সকলেই চমকে উঠলাম দারুণভাবে। র‍্যাবেনারের কপাল বেয়ে ঝরঝর করে রক্তের স্রোত নেমে এল। ও যেন একবার হাত নেড়ে বারণ করতে গেল ফ্যাঙ্কুয়িস্টকে, তারপর মুখ থুবড়ে উলটে পড়ল মেঝেয়-পাতা কার্পেটের ওপর।

ফ্যাঙ্কুয়িস্টের মধ্যে সামান্য কোনও চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পেল না। খুব শান্তভাবেই সে আবার গর্বিত পা ফেলে অফিসঘরে ফিরে গেল। অন্য কারুর দিকে ফিরেও তাকাল না একবার। মনে হয় বিগত এত শতাব্দীর মধ্যে এ

ধরনের ঠাণ্ডা মাথায় খুন আর দ্বিতীয় ঘটেনি। ফ্যাঙ্কুয়িস্ট দৃশপটের বাইরে না-যাওয়া পর্যন্ত কারুর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না। সকলে যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল সাময়িকভাবে। তারপর হইচই শুরু হল। আমি কিন্তু কোনওদিকে না তাকিয়ে একনাগাড়ে ধারা-বিবরণী দিয়ে যাচ্ছিলাম সান্ধ্য-সম্পাদককে। আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের পত্রিকার সান্ধ্য-সংস্করণ শহরের সমস্ত স্টলে পৌঁছে গেল। এবং এত নিখুঁতভাবে এই রোমাঞ্চকর হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছে দিতে পারার জন্যে পত্রিকা-অফিসে আমার কদরও বেড়ে গেল বেশ খানিকটা। এই ধরনের একটা সুযোগের জন্যে অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম আমি।

খুনিকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশকে কোনওরকম ঝুটঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়নি। পুলিশ না-আসা পর্যন্ত সে নিজেই স্থির হয়ে অপেক্ষা করছিল অফিসঘরে বসে। পুলিশের লোক অবশ্য সরাসরি অফিসঘরে ঢুকতে ভরসা পায়নি প্রথমে। তাদের আশঙ্কা ছিল মেয়েটা আবার হয়তো খুন করে বসতে পারে। কারণ তখনও পর্যন্ত পিস্তলটা ওর হাতের মুঠোতেই ধরা ছিল। অবশেষে সাহসে বুক বেঁধে একজন পুলিশ-অফিসার পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। ফ্যাঙ্কুয়িস্ট তখন খুব শান্তভাবেই সিগারেট টানছিল চেয়ারে গা এলিয়ে। যেন কিছুই হয়নি, এমনই একটা মনোভাব।

বাসায় ফিরে এসেও আমি নিজের মানসিক উত্তেজনা দমন করতে পারছিলাম না। দু-পেগ নির্জলা স্কচও আমার কোনও সুরাহা করতে পারল না। কী কারণে র‍্যাবেনারকে সে খুন করতে গেল, সেটাই ভেবে পাচ্ছিলাম না কিছুতে। হঠাৎ রাগের বশে ঝোঁকের মাথায় খুন এটা নয়। খুব ধীরেসুস্থে ঠাণ্ডা মাথার খুন।

পরেরদিন সব কাগজেই বিশদভাবে খবরটা ছাপা হল। প্রথম পাতায় ছবিসহ অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই রোমাঞ্চকর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। নিহত র‍্যাবেনারের ছবি, পাশে জেল-হাজতে বসে-থাকা ফ্যাঙ্কুয়িস্টের ছবি। ফ্যাঙ্কুয়িস্টের চোখ-মুখ সেই একইরকম শান্ত এবং সংযত। খুন করার মুহূর্তে তাকে ঠিক এইরকমই দেখাচ্চিল। মনে হচ্ছে কোনও কিছুতেই তার মুখচ্ছবিকে বদলানো যাবে না। তবে সে এ-পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি। যেন একবারে বোবা মেরে গেছে। কেন সে হঠাৎ র‍্যাবেনারকে খুন করতে গেল সে-সম্পর্কে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করছে না। মিষ্টি কথায় অনেকক্ষণ ধরে বোঝানো হয়েছে তাকে। অবশ্য তার সামনে কেউ রুঢ় ভাষায় কথা বলবে সেটা মনে করাই বোকামি। কারণ পুলিশ অফিসাররাও আমাদের মতো রক্তমাংসের মানুষ। ওই মোহময়ী, ঘোর-ঝলসানো রূপের সামনে দাঁড়িয়ে আপনা থেকেই তাদের মন নরম হয়ে আসবে।

বিচার-পর্ব শুরু হবার হপ্তাখানেক আগে আমি স্থানীয় পুলিশ-ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। স্যামি-র বারে বসে তখন বীয়ার সহযোগে জলযোগ সারছিলেন তিনি। বাইরের জানলা দিয়ে তাঁকে দেখেই আমি বারের মধ্যে ঢুকে পড়লাম, এবং সোজা গিয়ে তাঁর সামনের খালি চেয়ারটা দখল করলাম।

বারকয়েক শীতল দৃষ্টিতে তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। পুলিশের লোকেরা সচরাচর এই দৃষ্টিতেই সাংবাদিকদের দেখে থাকে। তারপর এমন গোগ্রাসে খেতে শুরু করলেন, যেন তাঁর হঠাৎ কোনও জরুরি কাজ মনে পড়ে গেছে। এক্ষুণি ছুটতে হবে সেখানে।

—এভাবে খেলে দম আটকে যেতে পারে ক্যাপ্টেন! —মৃদু হেসে আমি বললাম। —তা ছাড়া আমার হাতে অনেক সময় আছে, এখনই আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। আপনি বরং ধীরেসুস্থে খাওয়া শেষ করুন।

—আমি তা জানি। —জোর করে মুখের মধ্যে একটা স্যান্ডুইচ ঠুসতে-ঠুসতে ঘড়ঘড়ে গলায় তিনি বললেন। —কিন্তু আপনাকে দেবার মতো আমার কাছে কোনও খবর নেই।

—শুধু একটা প্রশ্ন, —আমি বলাম —মেয়েটা কি মুখ খুলেছে ?

—বললাম না, একটা কথাও আমি বলব না! —ধমক দিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

—ঠিক আছে, না-হয় না-ই বললেন। —আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—তবে কাল সন্ধ্যেবেলা লালচুলের যে মেয়েটির সঙ্গে আপনি পানাহারে ব্যস্ত ছিলেন, তাকে কিন্তু রীতিমতো সুন্দরী-ই বলতে হবে। সত্যিই আপনার নির্বাচনের প্রশংসা করতে হয়!

ক্যাপ্টেন চকিতে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। মুখ-চোখের অবস্থা দেখে আশঙ্কা হল, এক্ষুণি বুঝি তাঁর একটা স্ট্রোক হবে। তাঁর ঘাড়টা খানিক লম্বা হয়ে গেল, চোখ দুটো ছানাবড়ার মতো হয়ে উঠল। অবশেষে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ফ্যাসফেসে গলায় প্রশ্ন করলেন—এ খবরটা আপনি আবার কোত্থেকে জোগাড় করে আনলেন ?

বললাম—খবর জোগাড় করাই আমার পেশা। সেই ধান্দায় দিনভর নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। আশাকরি আপনিও তা জানেন ?

এবারে ক্যাপ্টেন বেশ রেগে উঠলেন। —কিন্তু মনে রাখবেন, এটা কোনও ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। এসব খবর যেন কাগজে না বেরোয়।

—জনসাধারণের সম্পর্কে আপনার তেমন আগ্রহ নেই দেখতে পাচ্ছি! আসলে এই ধরনের মুখরোচক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির কথাই তো সকলে বিশেষ করে জানতে চায়। আপনার অনুরোধ রাখতে পারছি না বলে আমি খুবই দুঃখিত, ক্যাপ্টেন। কাল সকালেই খবরটা কাগজে বেরুবে। এতে যদি আপনার সতীসাধ্বী স্ত্রী ক্ষেপে যান তবে তার জন্যে আমি আর কী করতে পারি! ক্যাপ্টেন

এবার ফাটা বেলুনের মতোই চুপসে গেলেন। —ঠিক আছে, —তেঁতো গলায় তিনি বললেন—আপনি কি জানতে চান, বলুন ?

আমি আবার চেয়ারে বসে বেয়ারাকে ডেকে এক প্লেট স্যান্ডুইচের অর্ডার দিলাম। তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে তাকিয়ে নরম সুরে বললাম—একবারে প্রথম থেকেই এই ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত। এবং আমি এর শেষ পর্যন্ত থাকতে চাই। আপনি যদি এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তবে আমিও আপনার সম্পর্কে মুখ বন্ধ রাখব। আমাদের মধ্যে এটা একটা ভদ্রলোকের চুক্তি বলতে পারেন।

লালচুলের সুবাদে কাপ্টেনের পেট থেকে কথা বের করতে বেশি সময় লাগল না। ভদ্রলোক যা বললেন তার সারমর্ম এই ঃ র‍্যাবেনার লোকটা ছিল এ শহরের পয়লা নম্বরের মাদকের চোরা-কারবারি। ব্রডওয়ের ওই রেস্তোরাঁটা ছিল শুধুমাত্র একটা লোক-দেখানো ব্যাপার। তা ছাড়া যেসব খরিদ্দার তার কাছে চেরাই মাদক কিনতে আসতো, তাদের সঙ্গে লেনদেনের জন্যেও একটা নিরাপদ আস্তানার দরকার। এমন একটা কর্মব্যস্ত রেস্তোরাঁর মতো নিরাপদ আস্তানা আর কোথায় পাওয়া যাবে! শুধু তাই নয়, র‍্যাবেনার ছিল একজন ওস্তাদ খুনে। ভাড়াটে খুনে হিসেবে তার নামডাকও ছিল বিস্তর। ক্রমে ক্রমে নিজের যোগ্যতার জোরে ও নিজেই খুনে আর ডাকাতদের নিয়ে বিরাট একটা দল গড়ে তুলেছিল। ও-ই ছিল তাদের দলপতি। তবে ও ছিল তুখড় আর ধুরন্ধর। সব সময় আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ত। কখনও সামনে আসত না। ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো একে একে ওর দলের সকলকে পাকড়াও করলেও সুনির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে ওর গায়ে কোনওদিন হাত দিতে পারেনি। এরপর র‍্যাবেনার মাদকের চোরা-চালানের ব্যবসা শুরু করল। ওর কাজ-কারবার এতই নিখুঁত ছিল যে ওই রেস্তোরাঁটাকে চোরাই-মাদক-বিতরণ কেন্দ্র হিসেবে কেউ কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি।

কোনও-না-কোনওভাবে ফ্যাঙ্কুয়িস্ট এই জাতীয় ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যোগাযোগটা যে ঠিক কোথায় সে-সম্পর্কে ক্যাপ্টেনের স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই। তবে এই মাদক-ব্যবসার সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটাও একবারে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। র‍্যাবেনারের কাছ থেকে যারা নিয়মিত মাদক সংগ্রহ করত তাদেরও আর কোনও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। একমাত্র ফ্যাঙ্কুয়িস্টই পুলিশকে কোনও-রকম সূত্রের সন্ধান দিতে পারে। অথচ কোনও প্রশ্নেরই সে জবাব দিচ্ছে না।

—এমনও তো হতে পারে যে কারুর ভয়ে সে মুখ খুলছে না—মন্তব্য করলাম আমি। —তা হলে হয়তো বরাবরের মতো তাকে পৃথিবী থেকে সরে যেতে হবে।

—হ্যাঁ, তেমন সম্ভাবনাও থাকতে পারে। —ক্যাপ্টেন মাথা নাড়লেন। —তবে র‍্যাবেনারকে খুন করার তার কী প্রয়োজন পড়ল ?

—আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। —আমি বললাম। —আচ্ছা, মেয়েটা কি ছাড়া পাবে বলে আপনি মনে করেন ?

ক্যাপ্টেন কাঁধ ঝাঁকালেন। —পেতেও পারে। এবং পেলেও আমি কিছু মনে করব না। কারণ মেয়েটাকে যথার্থ সুন্দরী বলা চলে।

আমিও সর্বান্তঃকরণে তাঁর বক্তব্য সমর্থন করলাম।

অবশেষে বিচারপর্ব শুরু হল। আদালতে আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই। শক্তসমর্থ পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল মহিলাদের ঠেলেঠুলে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। মহিলারা হতাশ হয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে পুরুষদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিল। পুরুষদের অবশ্য খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। কারণ এই মামলাটাতে তাদেরই বেশি উৎসাহ জাগা স্বাভাবিক। তারা সকলেই হন্যে হয়ে ফ্যাঙ্কুয়িস্টকে দেখতে এসেছে। কোনও বাধাই এখন তারা গ্রাহ্য করবে না।

বিচারকের আসনে যিনি বসেছিলেন তাঁর চেহারা অনেকটা আফিমখোর বুড়ো হাউন্ডের মতো। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে দেখে মনে হল, তিনি নিজে বেশ নার্ভাস বোধ করছেন। কেবলমাত্র ডিফেন্স কাউন্সেলই নির্বিকার, অবিচল। জুরিদের মধ্যে একজনও মহিলা নেই। সুন্দরী ফ্যাঙ্কুয়িস্ট যে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে রকমসকম দেখে সেই ধারণাই দৃঢ় হয়।

আমি একবারে সামনের সারির একটা চেয়ারে বসেছিলাম। সঙ্গে ছিল এক প্যাকেট স্যান্ডুইচ। ফ্লাস্কের মধ্যে বরফ ও হুইস্কি। আমি জানি কেউ আমাকে আমার জায়গা থেকে নড়াতে পারবে না। পত্রিকার নৈশ-সম্পাদক জ্যাকসনও আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা দুজনেই এই মামলাটার ব্যাপারে সমানভাবে আগ্রহী হয়ে পড়েছিলাম।

ফ্যাঙ্কুয়িস্টকে দারুণ দেখাচ্ছিল। তার কৌশলির পাশেই বসেছিল সে। স্থির, শান্ত, সংযত। পরনের পোশাক-আশাকও কী অপূর্ব! কোনও অনভিজ্ঞ যুবক যদি রমণীয় নারীদেহের সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করতে চায় তবে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার ফ্যাঙ্কুয়িস্টের দিকে তাকিয়ে দেখলেই তার অভিলাষ চরিতার্থ হবে। এক পলকে সে যে-জ্ঞান সঞ্চয় করবে, বছরভর অ্যানাটমির মোটা টেক্সট-বই ঘেঁটেও তার ধারেকাছে পৌঁছতে পারবে না।

—আমাকে যদি পুরো একটা দিন এই তরুণীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় —নৈশ-সম্পাদক আমার কানের কাছে ফিসফিস করলেন—তাহলে আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব।

স্বাস্থ্যবতী মেয়ে দেখলেই জ্যাকসনের মুখ দিয়ে লালা ঝরে, তবু ওর বর্তমান মানসিক অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি। সারা আদালত জুড়েই এখন এক রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ জমাট বেঁধে আছে।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এই মামলা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক বক্তৃতা দেবার উদ্দেশ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতার মধ্যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে ঝাঁঝাল ভর্ৎসনার ইঙ্গিত নিহিত থাকে, এখানে তার আভাসটুকুও পেলাম না। তবে তিনি যেভাবেই মামলাটা উত্থাপন করুন না কেন, মূল ঘটনাকে তো আর অস্বীকার করতে পারেন না। ফ্যাঙ্কুয়িস্ট যে নিজের হাতে র‍্যাবেনারকে খুন করেছে তার অসংখ্য সাক্ষী থেকে গেছে। তাই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজ করার মতো কোনও পথ খুঁজে পেলেন না। সরকারি কৌশলির প্রাথমিক বক্তৃতা শেষ হবার পর ডিফেন্স কাউন্সেল গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে-মুখে উদ্বেগের কোনও চিহ্ন নেই। —মহামান্য আদালতের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, —অবিচল কণ্ঠে তিনি বললেন—এই মামলার বিচার-পর্ব শুরু হওয়ার আগে সদাশয় ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কাছে আমি একটা প্রশ্ন রাখতে চাই।

বিচারপতির অনুমতি পেয়ে তিনি সরকারি কৌশলির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ফিরে তাকালেন।

—র‍্যাবেনারের খুলির মধ্যে থেকে যে বুলেটটা পাওয়া গেছে সেটা যে আমার মক্কেলের অটোমেটিক পিস্তলের বুলেট, সে-বিষয়ে আপনি কি নিশ্চিত ?

সমগ্র আদালত-কক্ষ জুড়ে একটা থমথমে নীরবতা নেমে এল। সে নীরবতাকে যেন হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সারা মুখে রামধনুর সাতটা রং খেলে গেল। নড়বড় করতে করতে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। —ইওর অনার, —ক্ষীণ, দুর্বল কণ্ঠে তিনি বললেন—আমি ... আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি ...

বিচারপতি এতক্ষণ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ফ্যাঙ্কুয়িস্টকে নিরীক্ষণ করছিলেন। তিনি ঠাণ্ডা-চোখে সরকারি কৌশলির দিকে তাকালেন। —আমার মতে প্রশ্নটা খুবই নিয়মসঙ্গত। শুধু তাই নয়, এটা খুবই যোগ্য প্রশ্নও বটে!

প্রতিবাদী কৌশলি মৃদু হাসলেন। —খুব সম্ভবত আমার বিজ্ঞ বন্ধু এ-প্রশ্নের উত্তরের জন্যে তৈরি হয়ে আসেননি। সে-ক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করব, বুলেট-সংক্রান্ত সম্পূর্ণ রিপোর্ট আদালতে না-পৌঁছানো পর্যন্ত এই মামলার শুনানী মুলতুবি থাকুক।

বিচারপতি এবার গভীর দৃষ্টিতে ডিফেন্স কাউন্সেলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। —এমন একটা প্রশ্নই বা আপনি হঠাৎ তুললেন কেন ? —জানতে চাইলেন তিনি।

—ইওর অনার, —শান্ত গলায় জবাব দিলেন প্রতিবাদী কৌশলি —আমার মক্কেল র‍্যাবেনারকে খুন করেনি। র‍্যাবেনারের মাথার খুলিতে যে বুলেটটা পাওয়া গেছে সম্ভবত সেটা আমার মক্কেলের পিস্তলের বুলেট নয়। কারণ এই পিস্তলটা খুবই ছোট মাপের। এর বুলেটের সাইজও খুব ছোট। আমার বিশ্বাস যে বুলেটের আঘাতে র‍্যাবেনারের মৃত্যু ঘটেছে সেই বুলেট ছোঁড়া হয়েছে স্মিথ-ওয়েসন রিভলবার থেকে। সরকারি রিপোর্ট না-আসা পর্যন্ত এ-বিষয়ে আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না।

দু ঘণ্টার জন্যে আদালত মুলতুবি রাখলেন বিচারপতি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠল সকলে। এই দু ঘণ্টার জন্যে কেউ-ই তার জায়গা থেকে একচুল নড়ে বসেনি পর্যন্ত।

নতুন করে যখন আবার আদালতের কাজ শুরু হল, আমার ধারণা মাত্র একজনই আগের মতো অবিচল থেকে গিয়েছিল। সে হচ্ছে ফ্যাঙ্কুয়িস্ট।

বিচারপতি এবার সরাসরি সরকারি কৌশলিকে লক্ষ করে বললেন—তা হলে আপনি রিপোর্টে কী পেলেন, বলুন ?

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে খুবই ম্রিয়মাণ, বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। —ইওর অনার, —দুর্বল কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন—প্রতিবাদী কৌশলি ঠিকই বলেছেন। যে বুলেটের আঘাতে র‍্যাবেনারের মৃত্যু ঘটেছে, সে বুলেটটা ছোঁড়া হয়েছে কোনও আর্মি-সার্ভিস রিভলবার থেকে।

সারা আদালত জুড়ে প্রচণ্ড একটা গুঞ্জরণ শুরু হল। সকলে শান্ত হবার পর বিচারপতি ভ্রুকুটি-কুটিল চোখে ডিফেন্স কাউন্সেলের দিকে ফিরে তাকালেন। তার গলায় ক্রোধের ঝাঁঝ ফুটে উঠল। —এই মামলাটা বিচারের জন্যে আদালতে আনাই বা হল কেন ?

প্রতিবাদী কৌশলি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সোজা হয়ে। —আমি আপনাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি, ইওর অনার। আপনার নিশ্চয় স্মরণে আছে, যে রাতে এই খুনটা হয় সে রাতে র‍্যাবেনার তার রেস্তোরাঁয় বিশেষ এক ধরনের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছিল। আমার মক্কেল ফ্যাঙ্কুয়িস্টেরও একটা ভূমিকা ছিল তার মধ্যে র‍্যাবেনার তাকে নির্দেশ দিয়েছিল, ভাড়া-করা লোকেরা যখন নকল ছোরা বা রিভলবার দিয়ে মারামারি-কাটাকাটির অভিনয় করবে, ফ্যাঙ্কুয়িস্ট তখন একটা আসল পিস্তল দিয়ে র‍্যাবেনারকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়বে। আসলে সেটাও একটা অভিনয়। কারণ পিস্তলটা আসল হলেও তার মধ্যে কোনও বুলেট ছিল না। ফ্যাঙ্কুয়িস্ট যখন তার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা অনুযায়ী র‍্যাবেনারের কপাল লক্ষ্য করে ব্ল্যাঙ্ক-ফায়ার করে, ঠিক সেই মুহূর্তে সাইলেন্সার-লাগানো রিভলবারের সাহায্যে কেউ র‍্যাবেনারকে খুন করে। প্রকৃত খুনি বেশ সুকৌশলেই পরিস্থিতিটাকে নিজের কাজে লাগিয়েছিল। সেই হই-হট্টগোলের মধ্যে আসল অপরাধীকে কেউ লক্ষ করেনি। কারণ সবার দৃষ্টি তখন র‍্যাবেনার

আর ফ্যাঙ্কুয়িস্টের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। এমন কী আমার মক্কেলও এই খুনের ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেনি। পরে পুলিশ এসে যখন তাকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করে তখন সে বেশ ঘাবড়ে যায়। তার মনে হল, যেটাকে সে ফাঁকা পিস্তল বলে ভেবেছিল তার মধ্যেই হয়তো কোনও বুলেট ভরা ছিল। কিন্তু সে যে ভুল করে একজনকে খুন করে বসেছে, এই অনুভূতিটাই তার সমস্ত বোধবুদ্ধিকে অসাড় করে দিয়েছিল। তার অস্বাভাবিক আচার-আচরণের এটাই একমাত্র কারণ। আমি কিন্তু মৃতদেহটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম। তখনই বুঝতে পারলাম, এত ছোট সাইজের পিস্তলের বুলেট কখনোই এত বড় একটা ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে না। নিশ্চয় অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আর কেউ র‍্যাবেনারকে খুন করেছে। তবে এই খুনের ব্যাপারে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে এত অজস্র প্রত্যক্ষদর্শী থেকে গিয়েছিল যে পুলিশ-কর্তৃপক্ষ আর এ-সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমন কী তার হাতের পিস্তলটাও এ-পর্যন্ত অপরীক্ষিত অবস্থায় তুলে রাখা ছিল। এই ঘটনাটার ব্যাপারে নানান জনে নানান কথা বলতে শুরু করল। অবশ্য ফ্যাঙ্কুয়িস্ট যে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল, সেকথা বলাই বাহুল্য। র‍্যাবেনারের প্রকৃত হত্যাকারীর যদিও কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। পুলিশও আর এ-ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করল না। ফ্যাঙ্কুয়িস্ট যখন ফাঁকা পিস্তল দিয়ে র‍্যাবেনারকে ফায়ার করে, তখন তার গোপন প্রেমিক আড়াল থেকে আসল কাজটা হাসিল করে। কারণ মৃত্যুর আগের মুহূর্তে র‍্যাবেনারের সেই হতচকিত ফ্যাকাসে মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল, এই মজার নাটকে ফ্যাঙ্কুয়িস্টের ভূমিকার বিষয় ওর কিছু জানা ছিল না। এবং নিজের মৃত্যু যে আসন্ন সেকথাও র‍্যাবেনার মর্মে-মর্মে অনুভব করেছিল।

এর সবটাই অবশ্য আমার অনুমান। ভুলও হতে পারে আমার। তবে আপনারা নিশ্চয় জানেন, এ ধরনের মামলা হাতে পেলে একজন সাংবাদিক কী পরিমাণ কল্পনাবিলাসী হয়ে উঠতে পারে। এবং সবশেষে আমি যা খবর পেলাম, রহস্যময়ী ফ্যাঙ্কুয়িস্ট এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছে। পুলিশের নজর এড়াতে ওই জায়গাটা যে আদর্শস্থল সেকথা দুনিয়ায় সকলেরই জানা। এবার আপনারাই বলুন, ঘটনাটা বিচার করে আপনাদের কী মনে হয় ?

খুনির নাম স্ট্যান

(স্ট্যান দ্য কিলার)

জর্জ সিমেনোঁ

পাইপে মৃদুমন্দ টান দিতে দিতে ফুটপাতের ওপর দিয়ে ধীরেসুস্থে হেঁটে যাচ্ছিলেন মেইগ্রে। সহজাত অভ্যাসবশে দুটো হাত পিঠের দিকে টান-টান করে ছড়ানো। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা আলগা করে ধরা। তবে এই ভারী শরীর নিয়ে জনাকীর্ণ র‍্যু সেঁ—আঁতোয়া ধরে এগিয়ে চলা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ সময়টা হচ্ছে সকাল। এই সময় সমস্ত অঞ্চলটা ভিড়ে গিজগিজ করে। আকাশ থেকে ঝড়ে পড়ছে সোনালি সূর্যের আলো। ঘোড়ায়-টানা গাড়ি আর ফুটপাতে ডাঁই করে রাখা ঝুড়ি ভর্তি ফলপাকুড় আর আনাজপাতির ওপর সেই আলো এসে ঠিকরে পড়ছে। প্রায় সারা ফুটপাতই ঝুড়িতে-ঝুড়িতে বোজাই হয়ে গেছে।

এখন হচ্ছে বাজার করার সময়। রেস্তোরাঁয় বসে প্রাতরাশের সময়। তরিতরকারির দোকানে গিজগিজে ভিড়। মাংসের দোকানেও। পাশের রেস্তোরাঁ থেকে ধূমায়িত কফির গন্ধ ভেসে আসছে, মাঝেমাঝে চীজ-এর গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। গৃহবধূদের চোখে-মুখে বিরক্তি আর অবিশ্বাস। জিনিসপত্রের দাম যেন

আকাশ-ছোঁওয়া। তবুও জীবনধারনের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনতেই হয়। এই ভিড়ের মধ্যে দিয়েই পথ করে এগিয়ে চললেন মেইগ্রে। এখন যে মামলাটা তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে সেটা খুবই সাংঘাতিক রকমের জটিল।

রুয দ্য বিরাগ পেরিয়েই ছোট্ট একটা কাফে। সামনের দিকে তিনটে মাত্র টেবিল পাতা। তার নাম ব্যারেল অব বার্গ্যান্ডি। অন্য অনেক পথচারীদের মতো মেইগ্রে তারই একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন। এমন কী লম্বা ছিপছিপে চেহারার যে ওয়েটার তাঁর অর্ডার নিতে এল তার দিকেও ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন না তিনি। —একপাত্র শাদা মাঁক। —মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করলেন মেইগ্রে। ব্যারেল অব বার্গ্যান্ডির নতুন এই ওয়েটারটি যে ডিকেটটিভ জাঁভীয়ে সেকথা বাইরের কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারে না।

খানিক বাদেই ট্রের ওপর মদের পাত্র নিয়ে ওয়েটার আবার তাঁর কাছে ফিরে এল। সেইসঙ্গে এক টুকরো চিরকুটও এগিয়ে দিল তাঁর দিকে। ওয়েটার ফিরে যাবার পর মেইগ্রে কাগজের টুকরোটার দিকে নজর দিলেন। পরিষ্কার ছোট ছোট অক্ষরে লেখা ঃ

মহিলা বাজার করতে বেরিয়েছেন। এক-চোখোর কোনও পাত্তা নেই। ভোরবেলা চাপদাড়ি বেরিয়ে গেছে। বাকি তিনজন এখন নিশ্চয় হোটেলেই আছে।

দশটা নাগাদ ভিড় আরও বেড়ে গেল। ব্যারেল-এর পাশেই একটা স্টেশনারি দোকান সেল দিতে শুরু করেছে। কয়েকজন লোক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে নতুন এক কোম্পানির তৈরি বিস্কুট, কেক আর চীজ গছাবার চেষ্টা করছিল জনসাধারণের কাছে।

রুয দ্য বিরাগ-এর এক কোণে সস্তাদরের একটা হোটেল। মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক ভিত্তিতেই ঘর ভাড়া পাওয়া যায় সেখানে। ভাড়াটা অবশ্য অগ্রিম দিতে হয়। ধার-বাকির কারবার নেই সেখানে। হোটেলের ঘরগুলো ছোট ছোট অন্ধকার ঘুপচির মতো হলেও নামের বাহারে কোনও খামতি নেই। কালো সাইনবোর্ডের ওপর সাদা রঙে লেখা—হোটেল বোসেজুর।

পানীয়ের পাত্রে ধীরেসুস্থে চুমুক দিতে-দিতে মেইগ্রে অলস উদাসীন দৃষ্টিতে ভিড়ে-ঠাসা পথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বসন্তকালের রৌদ্রস্নাত পথের ওপর চলমান জনতার প্রবাহ। তবে খানিক বাদেই তাঁর লক্ষ্য রাস্তা ছেড়ে দূরের একটা বাড়ির খোলা জানলায় গিয়ে পড়ল। বাড়িটা ওই হোটেলের ঠিক উলটো দিকে। তার তিনতলায় একটা জানলার পাশে ছোটখাটো চেহারার এক বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধের সামনে খাঁচা সমেত একটা ক্যানারি পাখি। খাঁচাটা জানলার গায়ে ঝুলছে। বৃদ্ধের রকম-সকম দেখে মনে হয় পার্থিব জীবন সম্পর্কে তার আর লেশমাত্র আগ্রহ নেই। ঈশ্বর বাঁচিয়ে রেখেছেন বলেই শুধু বেঁচে থাকা।

এবং এই উদাসীন বৃদ্ধ—মেইগ্রের দিকে যার কোনও লক্ষই ছিল না, সে হোল সার্জেন্ট ল্যুকা। আর তার বয়স মাত্র একুশ বছর।

এ সমস্তই পুলিশের তরফ থেকে গোপন যুদ্ধ-প্রস্তুতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ। পুলিশি পরিভাষায় একে ফাঁদ পাতা বলা হয়। গত ছ'দিন যাবৎ এইসব কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। এবং নিদেনপক্ষে দিনে দু'বার সশরীরে হাজির হয়ে ইন্সপেক্টর যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ করে নিয়ে যান। রাতের বেলা ইন্সপেক্টরের অধীনস্থ কর্মচারিদের ছুটি দেওয়া হয়। তখন বিচার বিভাগের একজন টহলদার গোয়েন্দা এসে তাদের স্থান দখল করে। আঁটোসাঁটো পোশাক-পরা এক তরুণীও আসে। হাবভাবে তাকে পতিতা বলেই মনে হয়। সেইভাবেই সারারাত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। যদিও কখনও তাকে খদ্দের ধরতে দেখা যায় না।

ব্যারেল অব বার্গ্যান্ডির যে চেয়ারে মেইগ্রে বসেছিলেন সেটা একবারে রাস্তার ধার বরাবর। চলমান জনতার স্রোত প্রায় তার গায়ের ওপর এসে পড়ার উপক্রম করছিল। সেইজন্যে সামনের দিকে ছড়ানো পা দুটোকে মাঝে-মধ্যে টেবিলের নীচে চালান করে দিতে হচ্ছিল তাঁকে। এরই ফাঁকে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল পাশের খালি চেয়ারটায় আর একজন নতুন লোক এসে বসেছেন। ভদ্রলোক ছোটখাটো চেহারার, চোখদুটো বিষাদ-ভাবাতুর। দুঃখী-দুঃখী মুখটা ঠিক যেন সার্কাসের ক্লাউনের মতো দেখতে।

—আবার... আবার আপনি এসেছেন ?—রাগে ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন ইন্সপেক্টর।

—আমাকে মাপ করবেন, 'মঁসিয়ে মেইগ্রে। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, শেষমেশ আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি হবেন যার ফলে ..., কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে ছদ্মবেশী ওয়েটার জাঁভীয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আমার বন্ধুকে যা দিয়েছেন আমাকেও তাই দিন।

ভদ্রলোক যে ইউরোপের পূর্বাঞ্চল থেকে প্যারিসে এসে আস্তানা গেড়েছেন সেটা তাঁর কথার ধাঁচেই বোঝা যায়। সম্ভবত আগন্তুকের গলায় কোনও অসুখ আছে। চুরুটের মতো দেখতে একটা বস্তু তিনি নাগাড়ে চিবিয়ে চলছিলেন। তার মধ্যে তৈলাক্ত ওষুধ ভরা। সেটা চিবোনোর ফলে সেই ওষুধ চুঁইয়ে চুঁইয়ে গলায় এসে পড়ে।

—আপনি দেখছি সত্যিই আমাকে পাগল করে ছাড়বেন! —মেইগ্রে এবার রাগে ফেটে পড়লেন।

—দয়া করে বলবেন, আজ সকালে আমি যে এখানে আসব সেটা আপনি জানতে পারলেন কোথা থেকে ?

—না, মানে আমি ঠিক জানতাম না। —আমতা-আমতা করতে লাগলেন আগন্তুক।

—তা হলে আপনি এখানে এসেছেন কেন ? আপনি কি বলতে চান, হঠাৎ এই দেখা হয়ে যাওয়াটা এক দৈব দুর্ঘটনা ?

—না, তা ঠিক নয়! —ভদ্রলোকের হলুদ চোখের দৃষ্টি মেইগ্রের মুখের আশপাশ দিয়ে দূরে শূন্যের দিকে নিবন্ধ। কণ্ঠস্বরে গভীর শোকের ছোঁওয়া। আপনি কিন্তু আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করছেন না, মঁসিয়ে মেইগ্রে!

—এটা আমার প্রশ্নের উত্তর নয়। আমি জানতে চাই আজ সকালে আপনি হঠাৎ এখানেই বা এলেন কেন?

—আমি আপনাকে অনুসরণ করছিলাম।

—পুলিশের সদর-দপ্তর থেকে?

—না, তারও আগে। আপনার বাসা থেকে।

—তার মানে আপনি আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করছেন?

—না ... না, মঁসিয়ে মেইগ্রে, আপনি আমায় ভুল বুঝছেন। আপনাকে আমি সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। আমার উদ্দেশ্যের কথা তো আগেই আপনাকে জানিয়েছি। আমি আপনার সহযোগী রূপে ...

মাঝপথে থেমে গিয়ে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। ভাব দেখে মনে হল দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার দরুন স্বদেশের জন্যে তাঁর প্রাণটা বুঝি আকুলি-বিকুলি করছে। সেইসঙ্গে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কৃত্রিম চুরুটের কল্পিত ছাই ঝাড়লেন অ্যাশট্রের ওপর।

একটিমাত্র সংবাদপত্র ছাড়া আর কোনও কাগজই এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্য করেনি। এই বিশেষ পত্রিকাটি যে কোনসূত্রে খবরটা সংগ্রহ করল তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু শুধু এর ফলেই ইন্সপেক্টরের কাজটা হাজারগুণ জটিল করে তুলেছে। পত্রিকাটি জানিয়েছে ঃ পুলিশের বিশ্বাস করার যথেস্ট কারণ ঘটেছে যে, 'স্ট্যান দ্য কিলার' নামে খুনে-গুন্ডার দলটা বর্তমানে খোদ প্যারিসের বুকেই তাদের আস্তানা গেড়েছে।

খবরটা যদিও সত্যি তবে বিষয়টা গোপন রাখলেই পুলিশকে অনেক বেশি সাহায্য করা হত। গত চার বছরে এই বিদেশী গুন্ডার দলটা পাঁচ-পাঁচটা খামারবাড়ি লুট করেছে। প্রতিটি ঘটনাই ঘটেছে ফ্রান্সের উত্তর অঞ্চলে, এবং একইরকম পদ্ধতিতে। প্রতি ক্ষেত্রেই এই খুনে-গুণ্ডার দলটা তাদের কাজ হাসিলের জন্যে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন কোনও খামারবাড়ি বেছে নিয়েছে। সাধারণত জনাকয়েক বৃদ্ধ মিলেই এইসব খামারবাড়ি দেখাশুনা করত। প্রতিবারই হানাদাররা এসেছে হাটবারের রাত্রে। মুরগি, গরু, ভেড়া, শুয়োর এবং অন্যান্য ফসল বিক্রির দরুন যখন খামারবাড়িতে প্রচুর পরিমাণ নগদ টাকা মজুত থাকত, সেইরকম বিশেষ একটা দিনেই সদলবলে আবির্ভাব ঘটত তাদের।

আক্রমণকারীদের কাজকর্মের মধ্যে কোনও সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়নি। নির্জন রাজপথের ওপর যে ধরনের নৃশংস ডাকাতি হয়ে থাকে এদের কাজকারবারও অবিকল সেই রকম। মানুষের জীবনের যেন কোনও মূল্যই নেই এদের কাছে। খামারবাড়ির প্রত্যেককেই এরা নিষ্ঠুরভাবে খুন করত।

এমন কী নারী বা শিশুরাও এদের হাত থেকে রেহাই পেত না। পরে কেউ যাতে তাদের শনাক্ত করতে না-পারে সম্ভবত সেই কারণেই এই নির্বিচার হত্যালীলা।

দলে দু'জন না পাঁচজন না আটজন, সে-সম্পর্কে নিশ্চিত করে কেউ কিছু জানত না। তবে ঘটনার আগে প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিবেশীরা অকুস্থলের আশেপাশে ছোট একটা ট্রাককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখত। বারো বছরের একটা ছেলে বলেছিল, একটা কানা লোককে সে ওই ট্রাকের মধ্যে দেখেছে। কেউ-কেউ বলেছে, খুনিরা সব কালো মুখোশ পরে এসেছিল। আসল ঘটনা যাই হোক-না-কেন, এটা খুবই সত্যি যে খামারবাড়ির প্রত্যেকের কণ্ঠনালী তারা কেটে দু ফাঁক করে দিয়ে যেত।

প্যারিসের পুলিশ কর্তৃপক্ষের অবশ্য এ-ব্যাপারে ব্যস্ত হবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কারণ এই-সমস্ত মামলাগুলোর মীমাংসার দায়িত্ব ছিল ভ্রাম্যমাণ পুলিশ দপ্তরের, যারা বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। কিন্তু গত দু' বছরের মধ্যে তারা মামলার নিষ্পত্তি তো দূরের কথা, এ-সম্পর্কে সামান্য সূত্রের সন্ধানও দিতে পারেনি। গ্রামাঞ্চলের লোকেরাও তাই ক্রমশ পুলিশের ওপর তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলছিল।

অবশেষে লী থেকে কেমন একটা কানাঘুষা শোনা গেল। লী হচ্ছে একটা পোলিশ কলোনি। পোল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর লোকরা এখানে এসে কয়লা খনিতে কাজ করে। খবরটার যদিও নির্দিষ্ট কোনও সূত্র নেই, কোথা থেকে এর উৎপত্তি তারও সঠিক হদিশ পাওয়া যায় না। পোল্যান্ডের শ্রমিক-শ্রেণীর লোকেরা এখানে এসে কয়লা খনিতে কাজ করে। খবরটার যদিও নির্দিষ্ট কোনও সূত্র নেই, কোথা থেকে এর উৎপত্তি তারও সঠিক হদিশ পাওয়া যায় না। পোল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা নাকি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে এ-সব হচ্ছে স্ট্যান দা কিলার-এর দলের কাজ। কিন্তু পুলিশ যখন শ্রমিকদের আস্তানায় গিয়ে এ-সম্পর্কে ব্যাপক খোঁজখবর শুরু করল, তখন স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলতে পারল না। এ বলল, ওর কাছ থেকে শুনেছে, ও বলল কথাটা নাকি আর একজন তাকে বলেছে, কিন্তু ঠিক কে বলেছে তার কোনও খোঁজ মিলল না।

পরের ঘটনাটা ঘটল রিম-এর কাছাকাছি। এখানে এই খুনে-গুণ্ডার দলটা কমবয়সী এক কাজের মেয়েকে লক্ষ করেনি। মেয়েটা তখন খামারবাড়ির চিলেকোঠায় ঘুমোচ্ছিল। এই মেয়েটাই এই নৃসংশ খুনে-গুণ্ডাদের হাত থেকে প্রথম প্রাণে বেঁচে গেছে। চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওর। চিলেকোঠার একটা ফোকর দিয়ে ও অনেক কিছু লক্ষ করেছিল। আক্রমণকারীদের কথাবার্তা শুনে ওর মনে হয়েছিল ওরা জাতে পোলিশ। ওদের প্রত্যেকের মুখে মুখোশ পরা ছিল। দলটার মধ্যে একজন হচ্ছে কানা। আর একজনের মুখ-চোখ দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ঢাকা। তার চেহারাটাও দৈত্যের মতো দশাসই।

সেই থেকে পুলিশ এই দলটার নাম দিয়েছিল স্ট্যান দ্য কিলার। এদের একজনের নাম দিয়েছে চাপদাড়ি, আর একজনের নাম একচোখো।

রিম-এর ঘটনার বেশ কয়েকমাস পরেও এ-সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানা যায়নি। বিভিন্ন শহরের হোটেলগুলোর ওপর নজর রাখার জন্যে আলাদা একটা গোয়েন্দা বিভাগ ছিল। যে গোয়েন্দার ওপর সেঁ-আঁতোয়া অঞ্চলের দায়িত্ব ছিল, তার হঠাৎ নজরে পড়ল রুয় দ্য বিরাগ-এর একটা সস্তাদরের হোটেলে একদল সন্দেহভাজন বিদেশী এসে আস্তানা গেরেছে। তাদের একজন কানা, আর একজনের সারা মুখ দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ঢাকা। তার চেহারাটাও দৈত্যের মতো বিশাল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এরা দরিদ্র শ্রেণীর। দাড়িওলা দৈত্য এক হপ্তার জন্যে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। সে আর তার স্ত্রী থাকে। তবে প্রায় প্রতিরাত্রেই ওদের চেনাপরিচিত কয়েকজন ওই ঘরে আশ্রয় নেয়।

পুলিশের তরফ থেকে সবকিছু খুব গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু এত গোপনীয়তা সত্ত্বেও একটা পত্রিকায় কীভাবে এই খবরটুকু বেরিয়ে গেল। এর পরের দিন মেইগ্রের নামে ডাকে একটা চিঠি এল। ছেলেমানুষের মতো আঁকাবাঁকা জড়ানো হাতের লেখা, অজস্র বানান ভুলে ভর্তি, খেলো কাগজে লেখা দু'লাইনের চিঠি।

যতই চেষ্টা কর না কেন, স্ট্যানকে ধরা তোমার কম্মো নয়। তার নাগাল পাবার আগে সে আরও অনেককে খুন করার সময় পাবে।

এই চিঠিটা যে কোনও হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয় মেইগ্রে তা বুঝতে পেরেছিলেন। এর বক্তব্যও খুব খাঁটি।

—ভেবেচিন্তে সাবধানে এগোবে! —পুলিশ-প্রধান মেইগ্রেকে জানিয়েছিলেন। —তাড়াহুড়ো করে এখনই কাউকে গ্রেপ্তার করার দরকার নেই। যে খুনেটা গত চার বছরে ষোলো জনের গলা কেটেছে, ফাঁদে পড়েছে জানতে পারলে আরও দু'চারজনের প্রাণ নিতে তার হাত কাঁপবে না। সেইজন্যেই এখন জাঁভীয়েকে ওয়েটার সেজে রেস্তোরাঁয় কাজ করতে হচ্ছে। আর বৃদ্ধের ভেক ধরে খোলা জানলার সামনে বসে আপন মনে রোদ পোহাচ্ছে যুবক ল্যাকা।

এই অঞ্চলের মানুষজনের কোনও ধারণাই নেই যে একদল খুনে-গুণ্ডা ফাঁদে পড়েছে জানতে পারলে মরিয়া হয়ে চারদিকে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে পারে। মেইগ্রে যখন মনে মনে এইসব চিন্তা-ভাবনা করছিলেন ঠিক তখনই মাইকেল ওজেপের আবির্ভাব ঘটল।

চারদিন আগে ওজেপের সঙ্গে মেইগ্রের প্রথম দেখা হয়েছিল। খোদ পুলিশের সদর দপ্তরে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে জেদ ধরেছিলেন ভদ্রলোক। মেইগ্রে তাঁকে টানা দু'ঘণ্টা ওয়েটিংরুমে বসিয়ে রেখেছিলেন। ভদ্রলোক কিন্তু নাছোরবান্দা। অবশেষে দু'ঘণ্টা বাদে মেইগ্রের

সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন তিনি। ঘরে ঢুকেই সর্বপ্রথম সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানালেন মেইগ্রেকে।

—আমি মাইকেল ওজেপ, পোলিশ সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। এখন আমি এখনকার একটা স্কুলে জিমন্যাসটিক শেখাই। বর্তমানে সেটাই আমার পেশা।

ভদ্রলোকের উচ্চরণ-ভঙ্গি এতই অদ্ভুত আর এত তাড়াহুড়ো করে কথা বলেন যে, কী বলছেন সব সময় ঠিক বোঝা যায় না। তাঁর কথা থেকে এইটুকু জানা গেল যে তিনি বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। কিন্তু স্বদেশে ফিরে গিয়ে নিজের পৈতৃক বিষয়-আশয় পুনরুদ্ধার করা এখন আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কী দেশে ফিরে যাবার মতো প্রয়োজনীয় অর্থও তাঁর নেই। এখানে হাজার-রকম অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়েই কোনওভাবে দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁকে। অথচ এমনভাবে দিন কাটাতে তিনি অভ্যস্ত নন। তাই গভীর হতাশায় ডুবে যেতে-যেতে তিনি এখন নিজের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

—আপনি বিশ্বাস করুন, মঁসিয়ে মেইগ্রে—সহজাত অদ্ভুত সুরে তিনি বললেন—যথার্থই আমি একজন ভদ্রলোক। অথচ পেটের দায়ে এখন এমন সব লোককে শরীরচর্চার ট্রেনিং দিতে হয় যাদের কোনও শিক্ষা-দীক্ষা নেই, কোনও কালচার নেই। আমি খুবই গরীব। আমি ... আমি আত্মহত্যা করব বলে মনস্থির করেছি।

বদ্ধ পাগল! মনে মনে চিন্তা করলেন মেইগ্রে। এই ধরনের অনেক লোকই পুলিশের সদর দপ্তরে তাদের দুঃখের কাহিনী শোনাতে আসে। তিনিও এ-সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

—হপ্তা তিনেক আগে আমি শেন নদীতে ডুবে মরার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে জল-পুলিশের নজরে পড়ে যাই। তারা আমার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

একটা ছুতো করে আগন্তুককে বসিয়ে রেখে মেইগ্রে এক মিনিটের জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। জল-পুলিশের দপ্তরে ফোন করে জানতে পারলেন, ভদ্রলোক সত্যি কথাই বলেছেন।

—দিন ছয়েক আগে —মেইগ্রে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসার পর আবার শুরু করলেন আগন্তুক —আমি গ্যাসের সাহায্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম। হতচ্ছাড়া পিওনটা ঠিক সেই সময় এসে পড়ে। তার চিৎকার চেঁচামেচিতে সেদিনও আমার আর মরা হল না। আসল কথাটা হচ্ছে, সত্যিই আমি মরতে চাই। এই পৃথিবীতে আমার আর বেঁচে থাকার কোনও সার্থকতা নেই। একজন ভদ্রলোকের পক্ষে এভাবে দারিদ্রের জ্বালা সহ্য করে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই ভাবলাম, আপনার এখন আমার মতোই একজন বেপরোয়া লোকের দরকার। —মাঝপথে থেমে গেলেন ওজেপ।

—কীসের জন্যে ?

—স্ট্যান দ্য কিলারকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে।

মেইগ্রের ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল। —আপনি তাকে চেনেন ?

—না, শুধু নাম শুনেছি। তবে একজন পোলিশ হিসেবে এ-ব্যাপারে আমারও কিছু কর্তব্য আছে বলে আমি মনে করি। আমার দেশের একজন বদমাশ লোক এখানে এসে এভাবে খুন-রাহাজানি চালিয়ে যাবে সেটা মোটেই বরদাস্ত করা যায় না। আমি চাই গোটা গ্যাংটা পুলিশের হাতে ধরা পড়ুক। তবে যারা ওদের ধরতে যাবে তাদের মধ্যে কেউ-কেউ মারাও পড়তে পারে। কারণ এত সহজে ওরা ধরা দেবার পাত্র নয়। তাই আমি এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছি। কারণ আমি মরতেই চাই। একটা ভাল কাজে জীবন দান করলে মৃত্যুটা অন্তত সার্থক হবে।

এর কী জবাব দেবেন মেইগ্রে ভেবে পেলেন না। তাই বাঁধা বুলি আওড়ে গেলেন। —ঠিক আছে, আপনার ঠিকানাটা রেখে যান। আমরা আমাদের সিদ্ধান্তের কথা পরে আপনাকে চিঠিতে জানাব।

রু দে তুর্নালেত-এ ছোট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে মাইকেল ওজেপ বাস করেন। জায়গাটা রু দ্য বিরাগ থেকে খুব একটা দূরে নয়। অনুসন্ধান করে জানা গেল ভদ্রলোক নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন তা সবই সত্যি। তিনি ছিলেন পোলিশ সামরিক বাহিনীর সেকেন্ড লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট। কিন্তু যুদ্ধের পর কয়েক বছর তাঁর আর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। এখন প্যারিসে তিনি আর পাঁচজনকে শরীরচর্চার তালিম দিয়ে রুজি-রোজগারের ধান্দা করেন। ইতিপূর্বে দু-দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

যা হোক শেষ পর্যন্ত মেইগ্রে তাঁর ঠিকানায় অফিশিয়াল চিঠি পাঠালেন।

দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেও আমাদের পক্ষে সে-প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়। আপনার মহানুভবতার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। নমস্কারান্তে ...

ইসপেক্টরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে এরপর দু'বার কে দেজরফবর-এ হাজির হয়েছিলেন ওজেপ। দ্বিতীয়বার মেইগ্রের সঙ্গে দেখা না করে যেতেই চাইছিলেন না দপ্তর ছেড়ে। তিনি সেখানেই ধরনা দিয়ে পড়ে থাকবেন বলে জেদ ধরেছিলেন। সেই ওজেপ-ই এখন ব্যারেল অব বার্গ্যান্ডিতে মেইগ্রের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আছেন।

—আমার সাহায্য যে সত্যিই আপনার কাজে আসবে সেটা প্রমাণ করতে আমি বদ্ধপরিকর, মঁসিয়ে মেইগ্রে। গত তিনদিন ধরে আমি আপনাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছি। এবং এই তিনদিনে আপনি কি কি করেছেন, সমস্তই আমি নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারি। আমি এও জানি যে, ওয়েটার আমার সামনে মদের পাত্র রেখে গেল সে আসলে পুলিশেরই এক গোয়েন্দা। তা ছাড়া দূরের

ওই ফ্ল্যাটবাড়িটার তেতলার জানলার সামনে বসে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে যে রোদ পোহাচ্ছে, সেও আসলে আপনারই দলের লোক।

মেইগ্রের চোখমুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। দাঁতের ফাঁকে পাইপটা জোরে কামড়ে ধরে তিনি অন্য দিকে চেয়ে রইলেন। ওজেপের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আগের মতো একই সুরে তিনি নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তির জাল বুনে চললেন। তাতে কান দেবার কোনও ইচ্ছে মেইগ্রের ছিল না, কিন্তু তাঁর ওই অদ্ভুত উচ্চারণই জোর করে ইন্সপেক্টরের মনযোগ আকর্ষণ করছিল।

—আপনি তো আর পোল্যান্ডের লোক নন, মঁসিয়ে মেইগ্রে। পোলিশ ভাষাও আপনি জানেন না। সেইজন্যে আপনাকে সাহায্য করতে আমি এত ব্যগ্র হয়ে উঠেছি। কারণ গোটাকয়েক জঘন্য প্রকৃতির লোকের জন্যে আমাদের দেশের বদনাম ছড়াক, সেটা মোটেই আমার কাম্য নয়।

শুনতে-শুনতে ইন্সপেক্টর ক্রমেই আরও বেশি করে খেপে উঠছিলেন। কিন্তু প্রাক্তন সেকেন্ড লেফ্‌ট্‌ন্যান্টের সেদিকে খেয়াল ছিল না। তিনি তাঁর নিজের কথাতেই বিভোর।

—আপনি যদি স্ট্যানকে গ্রেপ্তার করতে যান তখন সে কী করবে ? তার পকেটে সারাক্ষণই দু-তিনটে লোড-করা রিভলভার থাকে। আত্মরক্ষার জন্যে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে সে। তার ফলে কত নারী এবং শিশু যে প্রাণ হারাবে বা আহত হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তার সামনে পড়লে কাউকেই সে রেয়াত করবে না। জনসাধারণ তখন পুলিশকেই এর জন্যে ...

—আপনি কি থামবেন ?

—কিন্তু আমার কথা আলাদা। আমি তো মরতেই চাই। হতভাগ্য ওজেপের জন্যে কেউ একফোঁটা চোখের জল ফেলবে না। আপনি শুধু আমাকে দেখিয়ে দিন, এই হচ্ছে স্ট্যান। আমি যেমন ভাবে আপনাকে অনুসরণ করেছি, ঠিক সেইভাবেই নিঃশব্দে তার পিছু নেব। যখন দেখব সে আর আমি ছাড়া ধারে-কাছে আর কেউ নেই তখন সোজাসুজি গিয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ জানাব। বলব, তুমি-ই হচ্ছ স্ট্যান দ্য কিলার। সত্যিই যদি সে স্ট্যান হয় তাহলে সে আমাকে গুলি করে মারার চেষ্টা করবে। তখণ আমি তার পা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ব। আহত হবার ফলে তার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। আপনি তাকে সহজে হাতকড়া পরিয়ে জেলে পাঠাতে পারবেন।

—ধরুন, আমি যদি আপনাকেই গ্রেপ্তার করি?—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মেইগ্রে বললেন।

—কেন ? আমাকে গ্রেপ্তার করবেন কেন ?

—আমার নিজের শান্তির জন্যে।

—এ কি বলছেন আপনি ? কী করেছে হতভাগ্য ওজেপ। আমি তো কোনও আইনভঙ্গ করিনি। বরং আইন ভঙ্গকারী অপরাধীরা যাতে ধরা পড়ে সেজন্যে আমি নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে রাজি আছি।

—আপনার এই অর্থহীন প্রলাপ বন্ধ করুন!

—মাপ করবেন, তা হলে আমার প্রস্তাবে আপনি রাজি আছেন তো ?

—না, মোটেই না।

—সেই মুহূর্তে এক সুন্দরী বিদেশিনী সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হাতে একটা বাজারের ব্যাগ। সামনের মাংসের দোকানটার দিকেই তাঁর লক্ষ্য।

মেইগ্রে এই মহিলার দিকেই তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল কোটের পকেট থেকে প্রমাণ সাইজের একটা রুমাল বের করে মেইগ্রে জোরে-জোরে মুখ মুছছেন।

—এই মহিলাই তো স্ট্যানের সঙ্গিনী, তাই না ? —চাপাকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ওজেপ।

—আঃ, থামুন তো!

—আমার ধারণা যে সত্যি সেটা আপনার হাবভাবেই টের পাওয়া যাচ্ছে। যদিও স্ট্যান আসলে কোনজন আপনি তা জানেন না। হয়তো ভাবছেন দাড়িওয়ালাই স্ট্যান। কিন্তু দাড়িওয়ালাকে ওর দলের লোকেরা বরিস বলে ডাকে। আর ওই কানাটার নাম শাসা। ও কিন্তু পোলিশ নয়। ওর জন্ম রাশিয়ায়। আপনি নিজে তদন্ত করলে এ-সব তথ্য জানতে পারতেন।

গৃহস্থঘরের যে-সমস্ত স্ত্রীরা রু সেঁ-আঁতোয়ার ভিড়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটায় ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা ব্যারেল অব বার্গ্যান্ডির এই আলাপ-আলোচনার লেশমাত্র আভাস পাননি। সুন্দরী বিদেশিনী এখন মাংসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হাড়-বিহীন মাংস কিনতে ব্যস্ত। ওজেপের চোখের মতো তাঁর দু'চোখের দৃষ্টিতেও কেমন এক ধরনের নিস্তেজ অবসন্নতা।

—আপনি হয়তো ভয় পাচ্ছেন যে এই সংঘর্ষে যদি আমি মারা পড়ি তা হলে সেজন্যে আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে, আমি একা মানুষ। দুনিয়ায় আমার প্রিয়-পরিজন কেউ নেই। আমি মারা গেলে কারুর কিছু যায় আসে না। দ্বিতীয়ত, আমি যে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় এই কাজে অগ্রসর হচ্ছি, এবং এর ফলে আমার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তাও আমার অজ্ঞাত নয়, সে-কথা তো আমি আমার চিঠিতেই জানিয়ে দিয়েছি।

হতভাগ্য জাঁভীয়ে খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে মনে মনে চিন্তা করছিল, মেইগ্রের নামে যে টেলিফোন মেসেজটা এসেছে সেটা কীভাবে তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। মেইগ্রেও জাঁভীয়ের এই নির্বাক অভিনয় লক্ষ করেছিলেন, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি এই নাছোড়বান্দা আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে গলগলিয়ে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

—শুনুন, মিঃ ওজেপ ...

—হ্যাঁ ... বলুন, মঁসিয়ে মেইগ্রে ?

—আবার যদি আপনাকে এই রু সেঁ-আঁতোর ধারে-কাছে দেখতে পাই তবে সেই মুহূর্তে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করব।

—তার মানে আপনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন ?

—আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে আপনি এখান থেকে সরে পড়ুন। না হলে এখনই আপনাকে জেলে পাঠাব।

ছোটখাটো মানুষটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, রীতিমতো সামরিক কায়দায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানালেন ইন্সপেক্টরকে, তারপর গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেলেন রেস্তোরাঁ ছেড়ে। মেইগ্রে তাঁর অধীনস্থ এক গোয়েন্দাকে সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। তিনি তাকে ইঙ্গিতে ওজেপকে অনুসরণ করতে বললেন।

জাঁভীয়ে অবশেষে মেইগ্রের সামনে আসার সুযোগ পেল। —এইমাত্র লুকা ফোন করেছিল। ওই ঘরে কয়েকটা বন্দুক দেখতে পেয়েছে বলে ও জানিয়েছে। পাঁচজন পোলিশ গতরাতে ওই ঘটনার পেছনের ঘরে শুয়েছিল। দু ঘরে যাতায়াতের জন্যে যে দরজাটা আছে সেটাও নাকি সারারাত খোলা ছিল। ওদের মধ্যে কয়েকজনকে মেঝের ওপর কম্বল বিছিয়ে শুতে হয়েছে। ... আচ্ছা, এতক্ষণ ধরে আপনি যে ভদ্রলোকের সঙ্গে বকবক করছিলেন তিনি কে ?

—ও কেউ না। ... কত বিল হয়েছে ?

এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরল জাঁভীয়ের। ওজেপের শূন্য গ্লাসটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল—ওঁর বিলও আপনি মেটাবেন ?

একটা ট্যাক্সি ধরে সদর-দপ্তরে ফিরলেন মেইগ্রে। অফিসঘরে ঢোকার মুখে দেখলেন, যে গোয়েন্দাটিকে ওওজেপের পেছনে লাগিয়েছিলেন কাঁচুমাচু মুখে সে দাঁড়িয়ে আছে।

—তোমাকে ফাঁকি দিয়ে লোকটা কেটে পড়েছে ?—ইন্সপেক্টর ধমকে উঠলেন। —এই সামান্য একটা কাজও ...

—না ... স্যার, ভদ্রলোক আমাকে ফাঁকি দিতে পারেননি। —মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করল গোয়েন্দা।

—তা হলে তিনি এখন কোথায় ?

—এখানে।

—তুমি তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছ ?

—না, তিনি-ই আমাকে এখানে টেনে আনলেন। বললেন, ইন্সপেক্টর মেইগ্রের সঙ্গে তাঁর জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ভদ্রলোক এখন ওয়েটিং রুমে বসে স্যান্ডুইচ চিবুচ্ছেন।

কাগজে-কলমে কাজের মধ্যে বিশেষ কোনও মহিমা নেই, তবে তার মধ্যেও সময়-সময় মামলার সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অনিচ্ছুকভাবে,

নিরক্তিসহকারে এই মামলার ব্যাপারে এ-যাবৎ যা রিপোর্ট পেয়েছেন, মেইগ্রে তা একটা কাগজে গুছিয়ে লিখে রাখছিলেন।

গত দু'হপ্তা ধরে এই দলটার পেছনে জোঁকের মতো গোয়েন্দারা লেগে আছে।

যাবতীয় তথ্য একটা কাগজে লিপিবদ্ধ করার পর মেইগ্রে স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এই বিদেশীদের সম্পর্কে এ-পর্যন্ত খুব সামান্যই তাঁরা জানতে পেরেছেন। এমন কী এই দলটায় মোট কতজন আছে তাও তাঁরা সঠিকভাবে বলতে পারেন না। ইতিপূর্বে এই দলটাকে যারা দেখেছে, বা দেখেছে বলে মনে করে তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী দলের লোকসংখ্যা চার কি পাঁচজন। আসল সংখ্যাটা তার বেশিও হতে পারে। কারণ সকলেই যে একসঙ্গে দল বেঁধে থাকবে তার কোনও মানে নেই। দু-একজন আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে। তা হলে সংখ্যাটা ছয়-সাতে গিয়ে দাঁড়ায়। র্যু দ্য বিরাগ-এ এই দলটার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ছ-সাতজনেরই খোঁজ পাওয়া গেছে।

হোটেলের নিয়মিত বাসিন্দা হচ্ছেন তিনজন। তাদের কাগজপত্রের মধ্যে কোনও গণ্ডগোল খুঁজে পাওয়া যায়নি। একজন হচ্ছে বিরস স্যাফট। পুলিশ যাকে চাপদাড়ি বলে উল্লেখ করে। সে ওই সুন্দরী স্বর্ণকেশীর সঙ্গে একঘরে স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করে। মহিলার নাম ওলগা জেরেস্কি। বয়স আঠাশ বছর। জন্ম ভিলনোয়। তৃতীয়জন সাশা ভোরোনৎসভ। তার একটা চোখ কানা। বরিস ওই মহিলার সঙ্গে একটা ঘরে থাকে, পেছনের ঘরটায় সাশা। দু-ঘরের মাঝখানের দরজাটা খোলাই থাকে সারাক্ষণ। প্রতিদিন সকালে ওই মহিলা-ই দোকান-বাজার করেন। গ্যাস স্টোভে রান্নাবান্নাও করেন নিজের হাতে। দাড়িওলা কদাচিৎ রাস্তায় বেরোয়। দিনভর একটা লোহার খাটে বসে পোলিশ ভাষার সংবাদপত্র পড়ে। তার দলেরই কোনও একজন সকালে সেটা কিনে আনে। একবার সত্যঘটনা-মূলক একটা অ্যামেরিকান ডিটেকটিভ ম্যাগাজিনও ওরা কিনে এনেছিল। দলের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল সেটা নিয়ে।

কানাটা অবশ্য অধিকাংশ সময় রাস্তায়-রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়ায়। মেইগ্রের লোক তখন ওকে অনুসরণ করে। সম্ভবত ও-ও তা জানে। তাই কখনও খুব বেশি দূরে কোথাও যায় না। মাঝে মাঝে পাবে ঢুকে দু'চারপাত্রে পান করে, কিন্তু ভুলেও কখনও বাইরের কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। বাকিদের সম্পর্কে ল্যুকার মন্তব্যই যথার্থ। তারা সবাই ভাসা-ভাসা। কখন আসে কখন যায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ওলগা তাদের সকলের জন্যে রান্না-বান্না করেন। সময়-সময় মেঝেয় শুয়েও রাত কাটায় তারা। যদিও এটা কোনও অভাবিত ব্যাপার নয়। অনেক সস্তার হোটেলেই এমন ব্যাপার ঘটে থাকে। এরা সকলেই দরিদ্র শ্রেণীর। একজন একটা ঘর-ভাড়া করে। তারপর তার চেনাজানা অনেকেই সেই ঘরে এসে আশ্রয় নেয়।

ভাসমান এই লোকগুলো সম্পর্কেও মেইগ্রে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। পুলিশের কেমিক্যাল প্লান্টে চাকরির জন্যে চেষ্টা করেছিল। তার পোশাক-আশাক খুবই জরাজীর্ণ হলেও সেগুলো যে এককালে কোনও এক সম্ভ্রান্ত দোকান থেকে তৈরি করা হয়েছিল, সেটা অন্তত বুঝতে পারা যায়। যে কোনও একটা কাজের খোঁজে সে শহরের পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়। একদিনের জন্যে একটা দোকানে সে স্যান্ডুইচ বিক্রির কাজ পেয়েছিল। আর একজনকে ডাকা হয় স্পিনিজ বলে। সে সারাক্ষণ স্পিনিজ শাকের মতো গাঢ় সবুজ রঙের একটা টুপি মাথায় চাপিয়ে রাখে। তার গায়ে ফিকে গোলাপি রঙের শার্টের সঙ্গে মাথার ওই টুপিটা বড়ই বিসদৃশ ঠেকে। সাধারণত সন্ধের ভোঁকে সে পথে বেরোয়। মঁমার্তে বারের সামনে গিয়ে ঘেরাফেরা করে। সম্ভ্রান্ত লোকের গাড়ি এলে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। দু-চার ফ্রাঁ বকশিস মেলে তাতে। গোলগাল চেহারার বেঁটে-মোটা লোকটার নাম পাফি। চেহারার সঙ্গে মিলিয়েই রাখা হয়েছে নামটা। তার পোশাক-আশাক দলের অন্যান্যদের চেয়ে কিছুটা ভদ্রসভ্য। এরা ছাড়া আরও দু'জন মাঝে-মধ্যে এদের কাছে আসে। তবে তারা এই দলেরই লোক কি না সঠিক বলা যায় না।

নিজের হাতে লেখা কাগজটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন মেইগ্রে। মনে মনে খুবই রেগে উঠছিলেন তিনি। একটা অস্বস্তির কাঁটা যেন খচখচ করছে তাঁর বুকের মধ্যে। কী-একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর নজর এড়িয়ে যাচ্ছে, অথচ কিছুতেই সেটা ধরতে পারছেন না। অবশেষে পেনটা টেনে নিয়ে আবার লিখতে শুরু করলেন ঃ

এই বিদেশী লোকগুলোকে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় এরা খুবই দরিদ্র। রুজি-রোজগারের জন্যে যে কোনওরকম কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু এদের ঘরের মধ্যে সবসময় বোতল-বোতল ভদকা মজুত থাকে। মাঝে-মধ্যে খানাপিনারও আয়োজন করা হয় বেশ রাজকীয় ভাবে। সম্ভবত ওরা বুঝতে পেরেছে পুলিশ ওদের ওপর নজর রেখেছে। তাই বাইরে এমন নিরীহ ভাব দেখিয়ে বেড়ায়। ওদের মধ্যে কেউ যদি স্ট্যান দ্য কিলার হয় হবে সে দাড়িওলা বরিস অথবা কানা সাশা। যদিও এর সবটাই নিছক অনুমান মাত্র।

নিজের এই রিপোর্ট সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু চিন্তাভাবনা না করেই তিনি সেটা সরাসরি চীফের হাতে তুলে দিলেন। এক ঝলক তার ওপর নজর বুলিয়ে চীফ বললেন—এর মধ্যে নতুন তো কিছুই দেখছি না ?

—না, তেমন কিছু নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শয়তানরা বুঝতে পেরেছে আমরা ওদের ওপর নজর রাখছি। তাই এখন ভালমানুষের ভেক-ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা জানে, গোটা পুলিশ-বাহিনীকে তো আমরা সারাক্ষণ ওদের পেছনে লাগিয়ে রাখতে পারব না। তার সুযোগ নিচ্ছে এখন।

—তোমার কি নিজস্ব কোনও পরিকল্পনা আছে ?

—দেখুন চীফ, আপনি হয়তো লোকের মুখে শুনতে পাবেন যে আমি মনে মনে কোনও প্রেরণা খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এই ধারণাটা পুরাপুরি ভ্রান্ত। আমি শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছি। যে কোনও একটা ঘটনার আভাস পেলেই আমি সদলবলে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। আত্মরক্ষার সামান্য সুযোগও পাবে না কেউ। ঘটনার গতি-প্রকৃতি তখন পুরোপুরি আমরাই নিয়ন্ত্রণ করব।

—তা হলে তুমি এখন ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছ ? —মুচকি হাসলেন চীফ। এই আত্মভোলা কাজের মানুষটির নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে তিনি পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল।

—তবে এটুকু আমি হলফ করে বলতে পারি, এটাই হচ্ছে স্ট্যান দ্য কিলারের গ্যাং। কেবল ওই মাথা-মোটা রিপোর্টারের জন্যেই আজ ওরা সতর্ক হয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছে। এখন প্রশ্ন, স্ট্যান আমায় ভয় দেখিয়ে এমন একটা চিঠিই বা লিখতে গেল কেন ? সম্ভবত ওর দুঃসাহসের বাহাদুরি দেখাবার জন্যে। এই ধরনের খুনেরা খুবই দাম্ভিক প্রকৃতির হয়। প্রায় সব পেশাদারদের মধ্যেই এমন দম্ভের প্রকাশ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ওদের মধ্যে স্ট্যান কে ? এই ডাকনামটাই বা সে অর্জন করল কোন সুবাদে! নামটা তো পোল্যান্ডের চেয়ে মার্কিন মুলুকেই বেশি প্রচলিত!

—আপনি তো জানেন, কোনও সিদ্ধান্তে আসার আগে আমি কতটা সময় নিই। ... বিগত দু-তিনদিন ধরে আমি শুধু এই বিদেশী দলটার মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করেছি। ফরাসি খুনেদের চেয়ে ওদের ধরন-ধারণ অনেক আলাদা। ... ওদের টাকাকড়ির দরকার, তবে সেটা রাতবিরেতে নাইট ক্লাবে গিয়ে আমোদ-স্ফূর্তি করার জন্যে নয়। এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য কোথাও কেটে পড়ার জন্যেও ওদের টাকা-কড়ির দরকার পড়েনি। কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্যেই ওদের অর্থের প্রয়োজন। কাজকর্ম না করে শুধু শুয়ে-বসে সিগারেট ফুঁকে আর বোতল-বোতল ভদকা গিলে ওরা দিন কাটাতে চায়। আমার বিশ্বাস প্রথম ডাকাতিটা করার পর টাকাকড়ি ফুরিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত এইভাবেই ওরা দিন কাটিয়েছিল। তহবিলে টান পড়লেই ওরা আবার নতুন করে মতলব ভাঁজতে শুরু করে। এ-ব্যাপারে মায়া-দয়ার কোনও ধার ধারে না। অসহায় শিশু এবং বৃদ্ধদের নির্মমভাবে খুন করতে একটুও হাত কাঁপে না ওদের। ... আমার মনে হয়, আমি ওদের কাজের ধারাটা ধরতে পেরেছি। সেইজন্যেই চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করছি। এমন কী পরবর্তী কাজের প্রস্তুতি হয়তো ইতিমধ্যে এখান থেকেই শুরু হয়ে গেছে!

—এখান থেকে ?

—হ্যাঁ, আমাদের এই ওয়েটিং রুমে। ছোটখাটো যে মানুষটা আমাকে মেইগ্রে বলে সম্বোধন করেন, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি আমাকে সব-

রকমভাবে সাহায্য করতে চান। ওঁর বিশ্বাস এটা নাকি আর এক ধরনের আত্মহত্যার প্রচেষ্টা।

—ওর মাথায় কি ছিট আছে ?

—থাকতে পারে। কিংবা হয়তো স্ট্যানেরই দলের লোকে। আমরা কী চিন্তা—ভাবনা করছি তার একটা হদিশ পেতে চান।

মেইগ্রে তাঁর পাইপের ছাইগুলো টোকা মেরে সামনের জানলার কার্নিশের ওপর ফেললেন। সেগুলো হাওয়ায় উড়ে গিয়ে কে দেজরফেবর-এর ফুটপাত দিয়ে হেঁটেযাওয়া কোনও পথচারীর টুপির ওপরও পড়তে পারে।

—ছোটখাটো এই মানুষটা আমায় খুবই ভাবিয়ে তুলেছেন! ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসতে-বসতে আবার শুরু করলেন ইন্সপেক্টর। —কোথায় যেন ওই মুখটা আমি দেখেছি! আমাদের ফাইলে না থাকলেও মুখটা আমার চেনা-চেনা। স্বর্ণকেশী ওই মহিলাও যেন একবারে আমার পরিচিত নন। এই মুখ সহজে ভোলা যায় না।

টেবিলে ভর দিয়ে চীফ এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। —আমাদের অনুমান, সুন্দরী এই মহিলাই স্ট্যানের স্ত্রী কিংবা প্রণয়িনী। তুমি তো দু'জনকেই খুব কাছ থেকে দেখেছ। এ-বিষয়ে তোমার কী ধারণা ?

—আপনি জানতে চান, এই মানুষটাই স্ট্যান কি না ? সম্ভাবনাটা একবারে নস্যাৎ করা যায় না।—ওর প্রস্তাবে কি তুমি রাজি হবে ?

—আমি এখন রাজি হবার কথাই চিন্তা করছি। —চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর। তাঁর মনে হল যা বলার ছিল সবই তিনি বলেছেন। —আপনি দেখবেন চীফ, এই হপ্তা শেষ হবার আগেই আমরা নিশ্চয় সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য প্রমাণের মুখোমুখি হতে পারব।

দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। সময় সন্ধ্যা

বসুন! —প্রায় ধমকে উঠলেন মেইগ্রে। দিনভর ওষুধ-ভরা এমন একটা কৃত্রিম সিগার চিবোতে আপনার অস্বস্তি হয় না ?

—না, মঁসিয়ে মেইগ্রে।

—আমার নাম মেইগ্রেৎ নয় মেইগ্রে। আপনার মুখের ওই অদ্ভুত উচ্চারণ শুনতে আমার স্নায়ুগুলো সব শিরশির করে ওঠে। .. সে যা হোক, এখন কাজের কথায় আসা যাক। আগের সিদ্ধান্তমতো আপনি কি এখনও মরতে প্রস্তুত ?

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে মেইগ্রে।

—আচ্ছা, গোলাগুলির কথা থাক। আপনাকে যদি বলা হয় ওই দাড়িওলা বা কানাটার সামনে গিয়ে বলুন, পুলিশ ওদের বিরুদ্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছে এবং ওদের গ্রেপ্তার করতে আসছে, আপনি তা হলে যাবেন ?

সানন্দে, মঁসিয়ে মেইগ্রে। ওই হোটেলের কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করে থাকব। তারপর একচোখোটা রাস্তায় বেরুলেই আমি আমর দায়িত্বটুকু সুষ্ঠুভাবে পালন করব। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়েছিলেন মেইগ্রে। কিন্তু ভদ্রলোকের মধ্যেছিটেফোঁটা প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ খুঁজে পেলেন না। নিজের সম্পর্কে এত নিশ্চিত এবং এত অচঞ্চল কোনও মানুষ মেইগ্রে আর দেখেননি। মাইকেল ওজেপ যখন তাঁর আত্মহত্যার পরিকল্পনার কথা বলেন, অথবা ওই খুনে-গুণ্ডা দলের মুখোমুখি হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সব সময় তাঁর মুখে নির্বিকার নিরাসক্ত ভাবটা লেগে থাকে। মনে হয় যেন তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করছেন।

—দু'জনের কারুর সঙ্গে কি ইতিপূর্বে কখনও আপনার আলাপ পরিচয় হয়েছে ?

—না, মসিয়ে মেইগ্রে।

—ঠিক আছে, আমি আপনাকে এই কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি। এর ফলে যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্যে আমি কিন্তু দায়ী থাকব না। —মেইগ্রে আড়চোখে ওজেপের মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটে কি না লক্ষ করার চেষ্টা করলেন। - দু-এক মিনিটের মধ্যেই আমরা রু্য সেঁ-আঁতোয়ার উদ্দেশে রওনা হচ্ছি। আমি বাইরে অপেক্ষা করে থাকব। ওই মহিলা যখন একা থাকবেন তখনই আপনি হোটেলের মধ্যে ঢুকবেন। মহিলাকে বলবেন, আপনি নিজেও একজন পোলিশ। এবং ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছেন, স্থানীয় পুলিশ-বাহিনী আজ রাত্রেই এই হোটেলে হানা দেবার পরিকল্পনা করেছে।

ওজেপ কোনও মন্তব্য করলেন না।

—কী হল, আমার বক্তব্য আপনার মগজে ঢুকল ?

—হ্যাঁ, তা অবশ্য ঢুকেছে। —মাথা নাড়লেন ওজেপ।

—তা হলে আপনি তৈরি তো ?

—একটা কথা আমি আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, মঁসিয়ে মেইগ্রে ...

—আপনার চোখ-মুখ হঠাৎ এত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন ?

—ফ্যাকাসে ? ... ওহো, না ... আমি ভয় পেয়েছি বলে ভাববেন না। আসল কথাটা হচ্ছে, আমি আপনার এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামান্য একটু পরিবর্তন ঘটাতে চাই। মানে ... মানে মহিলাদের মুখোমুখি হতে আমি কেমন অস্বস্তি বোধ করি। মেয়েরা যে কত বুদ্দিবতী হয় তা নিশ্চয় আপনি জানেন ? পুরুষদের চেয়ে তারা মগজে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে। তাই আমি যে মিথ্যে বলছি, মহিলা অতি সহজেই তা বুঝতে পারবেন। এবং আমি যখন জানতে পারব যে আমার মিথ্যেটা তিনি ধরতে পেরেছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি লজ্জা পেয়ে যাব। আমার কানের ডগাদুটো টকটকে লাল হয়ে উঠবে। এবং তার ফলে ... তার ফলে ...

মেইগ্রে ভদ্রলোকের এই অত্যাদ্ভুত যুক্তির কথা শুনে চিত্রাপির্তের মতো নিজের চেয়ারে বসে রইলেন স্থির হয়ে।

—তার চেয়ে কোনও পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে আমি অনেক বেশি সহজ-স্বাভাবিক হতে পারব। দাড়িওলা বা একচোখো, অথবা ওই দলের অন্য কেউ .. শার্সি ভেদ করে সূর্যের আলো তির্যকভাবে মেইগ্রের মুখের ওপর এসে পড়েছিল। ভরপেট খানাপিনার পর স্বাভাবিকভাবেই কেমন একটা ঢুলুনির আবেশ আসে। মনে হল মেইগ্রেও যেন সেইভাবে ঝিমুচ্ছেন।

—নীট ফলটা কিন্তু একই দাঁড়াবে, মঁসিয়ে মাইগ্রে।

কিন্তু মেইগ্রে কোনও জবাব দিলেন না। ঠোঁটের ফাঁকে কামড়ে-ধরা পাইপ থেকে নির্গত নীলচে ধোঁয়ার রেখাই শুধু জানিয়ে দিল যে তিনি এখনও প্রাণে বেঁচে আছেন।

—আমি খুবই নিঃসঙ্গ মানুষ, মঁসিয়ে। আপনি আমার কাছে এমন একটা দাবি পেশ করেছেন ...

—কথাটা ভুলে যান!

—মাপ করবেন, আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন ... ?

—আমি বলছি, ভুলে যান! ... ওলগা জেরেস্কির সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হল আপনার ?

—আমার ?

—হ্যাঁ, জবাব দিন!

—আপনার প্রশ্নের মাথা-মুণ্ডু কিছুই আমি ...

—আগে আমার কথার জবাব দিন।

—মহিলাকে আমি চিনি-ই না। চিনলে কি সেকথা আপনাকে জানাতাম না!

—মহিলার সঙ্গে আপনার পরিচয় কতদিনের ?

—দেখুন, হঠাৎ আপনি আমার সঙ্গে এ-ধরনের রূঢ় ব্যবহার শুরু করলেন কেন ? এখানে আমি সব-রকমভাবে আপনার সাহায্য করতে এসেছি। আমার দেশের কোনও খুনে-গুণ্ডার দল যাতে এদেশে তাদের কাজ করবার চালিয়ে যেতে না পারে ...

—বকবকানি থামান!

—মঁসিয়ে, দয়া করে আপনি আমাকে অন্য যে কোনও আদেশ করুন। যদি বলেন তবে আমি চলন্ত ট্রেনের নীচে ঝাঁপ দিতেও রাজি আছি।

—আমার নির্দেশ হচ্ছে, মহিলা যখন একা থাকবে আপনি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। বলবেন, পুলিশ-বাহিনী খুব শীগগিরই হোটেলে হানা দিতে আসছে।

—আমি ... আমি যদি আপনার নির্দেশ না মানি ?

—তা হলে মনে রাখবেন এটাই আমাদের শেষ দেখা। আপনার মুখ যেন আর কখনও আমাকে না দেখতে হয়।

—আপনি কি সত্যিই আজ রাতে ওদের গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছেন ?

—সম্ভবত।

—ঠিক ক'টার সময় আপনারা হানা দেবেন ?

—ধরুন রাত একটা নাগাদ।

—ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

—কোথায় ?

—ওই মহিলার খোঁজে।

—দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

—না, আমার একার যাওয়াই ভাল। ওদের কেউ যদি আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে ফেলে তা হলে ভাববে পুলিশকে সাহায্য করার জন্যেই ...

ভদ্রলোক বাইরে বেরুতে-না-বেরুতেই ইন্সপেক্টরের নির্দেশে শাদা পোশাকের একজন গোয়েন্দা তাঁকে অনুসরণ করল। মেইগ্রে নিজেও একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলেন। —জলদি চল। রু্য সেঁ-আঁতোয়ার মোড়ে।

উজ্জ্বল আলোয় ভরা বিকেল। রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে রাস্তার ধারে দোকানগুলোর মাথায় নানা রঙের ডোরাকাটা চাঁদোয়া টাঙানো ছিল। তারই ছায়ায় আড়মোড়া ভাঙছিল কুকুরগুলো। কেউ-কেউ ঝিমুচ্ছিল শুয়ে-শুয়ে। মনে হয় সবকিছুই যেন খুব মন্থর গতিতে চলছে। এমন কী যাত্রী বোঝাই বাসগুলোও যেন তপ্ত ভারী বাতাস ভেদ করে জোরে ছুটতে পারছে না। রাস্তার গরম অ্যাসফাল্টের ওপর চাকার দাগ বসছে গভীরভাবে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে মেইগ্রে দ্রুতপায়ে মোড়ের মাথার বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তেতলার একটা ঘরে ঢোকার আগে দরজায় নক্ করারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। ল্যুকা আগের মতোই জানলার ধারে বসে উদাসীন বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছিল।

ঘরটার চেহারা জীর্ণ হলেও মোটের ওপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। টেবিলের ওপর একটা প্লেটে ভুক্তাবশিষ্ট কিছু খাবারদাবারও পড়েছিল।

—কোনও নতুন নির্দেশ আছে কি ইন্সপেক্টর ?

—উলটো দিকের ওই ঘরে এখন কি কেউ আছে ?

এই ঘর থেকে হোটেল বোসেজুরের ওই ঘরদুটোর ওপর পরিষ্কার নজর রাখা যায়। সেই কারণেই এই ঘরটা বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত গরমের জন্যে সব ঘরেরই প্রতিটি জানলা এখন খোলা। পাশের একটা ঘরে স্বল্পবসনা এক যুবতীকে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা গেল।

—নাঃ, এখন আর তোমার এই কাজটাকে আমার খুব বেশি একঘেয়ে ক্লান্তিকর বলে বোধ হচ্ছে না! —সেই দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন মেইগ্রে।

চেয়ারের হাতলে ল্যুকার দূরবীনটা ঝোলানো ছিল। ওই ঘরদুটোর কিছুই ওর নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। —সামনের ওই ঘরে এখন দু'জন মাত্র আছে। তবে একজন সাজগোজ করে রাস্তায় বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। তখন শুধু একজন থাকবে। দাড়িওলা আজ সারাদিন শুধু বিছানায় শুয়ে-বসে কাটিয়েছে।

—কে বেরুচ্ছে ? দাড়িওলা ?

—হ্যাঁ। দুপুরের লাঞ্চের সময় তিনজন হাজির ছিল। দাড়িওলা, একচোখো আর ওই মহিলা। খাওয়া-দাওয়া সেরেই একচোখো বেরিয়ে গেছে। তারপর দাড়িওলা সাজগোজ করতে শুরু করেছে। ... কী আশ্চর্য! আজ দেখছি দৈত্যটা ধোপদুরস্ত শার্ট পরছে! এমন ঘটনা সচরাচর ঘটতে দেখিনি।

মেইগ্রে এগিয়ে এসে খোলা জানলার সামনে দাঁড়ালেন। দাড়িওলা দৈত্য তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধছে। ওর ঠোঁট দুটোও নড়তে দেখা যাচ্ছে সেই সঙ্গে। স্বর্ণকেশী মহিলা তখন বেসিনের জলে কাচের বাসনপত্র ধোওয়া-পোঁছার কাজে ব্যস্ত। তারপর হাতের কাজ শেষ করে পালকের ঝাড়ন দিয়ে দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির ধুলো ঝাড়লেন যত্ন করে।

—ওরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে, যদি আমরা জানতে পারতাম! —হতাশ গলায় মন্তব্য করল ল্যুকা। —মাঝে-মধ্যে এই চিন্তাটা আমাকে পাগল করে তোলে। একসঙ্গে জমায়েত হলে ওরা প্রায় সারাক্ষণ বকবক করে।

ওর কথায় মৃদু হাসলেন মেইগ্রে। —আমাদের পুলিশ দপ্তরের শক্তিসামর্থ অনেক বেশি। কিন্তু দূর থেকে শুধু ঠোঁট-নাড়া দেখে পোলিশ ভাষা বুঝে নেবার ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই। এদিকে থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি বলা যায়!

—এই ঘটনাটা আমার স্নায়ুর ওপর ভীষণ চাপ দেয়। কালাদের মানসিক যন্ত্রণাটাও এখন আমি অনুভব করতে পারি।

—তোমার কি মনে হয়, মহিলা এখন ঘরের মধ্যেই থাকবে ?

—সাধারণত এ-সময় উনি ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোন না। আর বেরুতে চাইলে ছাই-রঙা স্যুটটা পরতেন।

সকালে যে পোশাকে বাজারে বেরিয়েছিলেন, কালো পশমের সেই পোশাকটাই এখন গায়ে পরেছিলেন ওলগা। যখন তিনি তাঁর এই ছন্নছাড়া ঘর-গৃহস্থালি গোছগাছের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁর রক্তিম ঠোঁটের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ধরা ছিল। এক মুহূর্তের জন্যেও সে সিগারেট ঠোঁট-ছাড়া করেননি। তিনি যে একজন চেইন-স্মোকার, বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।

—মহিলা কি কথাবার্তা বিশেষ বলেন না ? —জানতে চাইলেন মেইগ্রে।

—বলেন, তবে এখন নয়। সন্ধেবেলা যখন সবাই এসে চারপাশে জড় হয় তখনই কেবল কথা ফোটে ওঁর মুখে। স্পিনিজ যখন একা থাকে তখনও আমি ওকে কথা বলতে দেখেছি। দলের মধ্যে ওকেই একমাত্র সুপুরুষ চেহারার বলা যায়। আমার ধারণা স্পিনিজের ওপর মহিলার যেন এক ধরনের দুর্বলতা আছে।

এইরকম একটা অপরিচিত ঘরে বসে রাস্তার বিপরীত দিকের একটা হোটেল ঘরের একদল অচেনা বিদেশীদের জীবনযাত্রা, চালচলন, মায় তাদের প্রতিটি খুঁটিনাটি অঙ্গভঙ্গি পর্যন্ত লক্ষ করাটা সম্পূর্ণ নতুন জাতের অভিজ্ঞতা।

—তুমি তো দেখছি পরের ব্যাপারে নাক গলাতে বেশ ওস্তাদ হয়ে পড়েছে, লুকা!

—সেই কারণেই তো আমাকে এখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে, স্যার! পাশের ঘরে স্বল্পবসনা যে যুবতীটি গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তার ইতিবৃত্তও আমি আগাগোড়া বলে যেতে পারি। আজ ভোর তিনটে পর্যন্ত সে ওই ঘরে তার প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমের খেলায় ডুবে ছিল। প্রেমিকের গায়ে ছিল ডিনার-জ্যাকেট। ভোর হতে-না-হতেই ছেলেটা চুপিসাড়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। সে রাতভর বাইরে ছিল সেটা হয়তো বাড়ির কাউকে জানতে দিতে চায়না, তাই কাকপক্ষী জাগার আগেই নিজের ডেরায় গিয়ে ঢুকে পড়বে। ... সে যা হোক, দাড়িওলা এখন বাইরে বেরুবার জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত।

—ওর ওপর নজর রাখো। আজ দেখছি বেশ সাজগোজ করে বেরুচ্ছে!

—হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে দেখে আমার বিদেশী কুস্তিগিরের মতো মনে হয়। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না।

—তা হলে বলতে হবে, কুস্তিগির এখানে বেশ ভালই ব্যবসা ফেঁদে বসেছে!

বাইরে বেরুবার আগে মহিলার সঙ্গে দাড়িওয়ালার কোনও কথাবার্তা হল না। দৈত্যটা যেন হঠাৎই ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই দেখা গেল হোটেলের সরু লন পেরিয়ে ও রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর সোজাসুজি প্লাস দে লা বাস্তেই-র দিকে হাঁটতে শুরু করল।

—দেরেঁয় ওকে ঠিক ধরে নেবে! —লুকার কণ্ঠে গভীর আত্মবিশ্বাসের সুর। কিন্তু ওকে যে ফলো করা হচ্ছে ও সেটা জানে। তাই পথে-পথে টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো বা রাস্তার ধারে কোনও পাবে ঢুকে দু-এক পাত্র পান করা ছাড়া আর কিছুই করবে না।

জানলা দিয়ে দেখা গেল, মহিলা নতুন করে একটা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর টেবিলের টানা থেকে একটা রোড-ম্যাপ বের করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। তিনি যেন গভীর মনোযোগ সহকারে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন মানচিত্রটা।

ওজেপ নিশ্চয় ট্যাক্সিতে আসছেন না, মেট্রো রেল তার চেয়ে অনেক সস্তায় হবে। মনে মনে হিসেবে করলেন মেইগ্রে। তার মানে এখন যে কোনও মুহূর্তে ভদ্রলোক এসে পড়তে পারেন। অবশ্য সত্যিই তিনি এসে হাজির হন কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। মেইগ্রের আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত করে দু-এক মিনিটের মধ্যেই তাঁর দর্শন পাওয়া গেল। হাঁটা-চলার মধ্যে কেমন একটা ইতস্তত ভঙ্গি। কারুর দিকে বিশেষভাবে না তাকিয়ে সামনের ফুটপাতের ওপর এলোমেলোভাবে পায়চারি করছেন। শাদা পোশাকের যে গোয়েন্দাটি এতক্ষণ তাঁর পেছন পেছন আসছিল, সে এখন গভীর আগ্রহের সঙ্গে রু্য সেঁ-আঁতোয়ার একটা মাছের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে মাছ দেখতে ব্যস্ত।

তিনতলার এই জানলা থেকে ছোটখাটো পোলিশটিকে আরও বেশি রোগা-পাতলা, আরও বেশি অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। লোকটার জন্যে হঠাৎ কেমন একটা দুঃখ হল মেইগ্রের। কাতর কণ্ঠে 'মঁসিয়ে মেইগ্রে ... মঁসিয়ে মেইগ্রে 'সম্বোধনটি এখনও তাঁর কানের মধ্যে বাজছে। ভদ্রলোক যে খুবই বিব্রত বোধ করছেন, সেটা ওঁর হাবভাবেই স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ভেতরে-ভেতরে ভয়ও পেয়েছেন বিস্তর।

—উনি এখন কার খোঁজ করছেন, জানো ? —ল্যুকাকে প্রশ্ন করলেন মেইগ্রে।

—ভাঙাচোরা চেহারার ওই পোলিশটার কথা বলছেন ? ... ঠিক বলতে পারি না। হয়তো কিছু টাকার ধান্দা করছেন, যেটা হাতে পেলে হোটেলের মধ্যে ঢুকতে পারা যায়।

—না, আমার খোঁজ করছেন। ভাবছেন আমি নিশ্চয় কাছে-পিঠে কোথাও আছি। এবং শেষ মুহূর্তে যদি হঠাৎ আমি আমার মত বদলাই ...

মেইগ্রের পক্ষে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আর সময় ছিল না। কারণ ইতিমধ্যে ওজেপ হোটেলের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। চোখে না দেখলেও মানসচক্ষে তাঁকে অনুসরণ করতে দু'জনের কারুর বিশেষ অসুবিধে হল না। ওজেপ নিশ্চয় এখন হেটেলের ভাঙাচোরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন।

—এখনও ওঁর দ্বিধা কাটেনি। —মেইগ্রে মন্তব্য করলেন। কেননা তা হলে ইতিমধ্যে তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতেন। —না, এখন হয়তো সিঁড়ি পেরিয়ে বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন! দরজায় নক্ করতে যাচ্ছেন! ... হ্যাঁ, এবার বোধহয় নক্ করলেন!

সুন্দরী স্বর্ণকেশী প্রথমে একটু চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ম্যাপটা আবার টেবিলের টানার মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কাউকেই আর দেখা গেল না। কারণ ঘরের ওই অংশটা এদিকের জানলা থেকে দেখা যায় না। কয়েক মুহূর্ত বাদেই আবার দেখতে পাওয়া গেল সুন্দরীকে। তাঁর ভাবভঙ্গির মধ্যে আচমকা যেন

একটা অভাবিত পরিবর্তন ঘটল। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে তিনি রাস্তার দিকের খোলা জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। জানলা সংলগ্ন পুরু পর্দাটাও টেনে দিলেন সেইসঙ্গে।

ল্যুকা হাসি-হাসি মুখে ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে তাকাল। —তা হলে! কিন্তু মেইগ্রের চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে আপনা থেকেই তার হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

—এখন সময় কত ল্যুকা ?

—তিনটে দশ।—ওদের দলের কেউ ক'টা নাগাদ হোটেলে ফিরে আসতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?

—সঠিক বলতে পারি না। তবে স্পিনিজ যদি টের পায় দাড়িওলা ঘরে নেই তা হলে সে যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। কিন্তু আপনাকে হঠাৎ এত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন ?

—এভাবে হঠাৎ জানলা বন্ধ করে দেওয়াটা আমার ঠিক ভাল ঠেকছে না।

—আপনি কি ওজেপের কোনও বিপদের আশঙ্কা করছেন ?

মেইগ্রে এ-প্রশ্নের কোনও জবাব দিলেন না।

—ভদ্রলোক কি সত্যিই মারা গেলেন না কি! —নিজের কথার খেই ধরে ল্যুকা বলল। —আমাদের হাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নেই। আমরা ওঁকে হোটেলের মধ্যে ঢুকতে দেখেছি। কিন্তু তিনি হয়তো অন্য কোনও ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। এবং আর কাউকে দেখেই মহিলা হয়তো ... মেইগ্রে এবারও কিছু বললেন না, শুধু বার-দুয়েক কাঁধ ঝাঁকলেন। মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল তাঁর বুক ঠেলে।

তোমার ঘড়িতে এখন ক'টা বাজে, ল্যুকা ?

—তিনটে বিশ। আপনি কি হোটেলে গিয়ে প্রকৃত ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখতে চাইছেন ?

—না, এখনও সে সময় আসেনি। তবে মনে হচ্ছে আমি যেন বোকার মতো কিছু করে বসেছি।

... এখানে তুমি ফোন করো কোথা থেকে ?

—পাশের ঘরেই এক দর্জির দোকান। সে প্রধানত অর্ডার-সাপ্লায়ের কাজ করে। ফোনও আছে তার ঘরে।

—ভালই হল। তুমি চীফকে একটা ফোন করো। কিন্তু সাবধান, লোকটা যেন শুনতে না পায়। চীফকে বল, আমি বলেছি এক্ষুণি জনাকুড়ি সশস্ত্র সেপাই পাঠাতে। তারা হোটেল বোসেজুরের আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে। আমার কাছ থেকে কোনও ইঙ্গিত না-পাওয়া পর্যন্ত সবাই যেন চুপচাপ থাকে।

মেইগ্রের এই নির্দেশ যে রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ সেটা তাঁর মুখ-চোখের অভিব্যক্তিতেই বুঝতে পারা গেল। সচরাচর এই জাতীয় পুলিশি অভিযান সম্পর্কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাই তাঁর স্বভাব।

—আপনার কি ধারণা আজ ওখানে মারাত্মক কিছু ঘটতে চলেছে ? —প্রশ্ন করল ল্যুকা।

—যদি না ইতিমধ্যেই তা ঘটতে শুরু করে।

তাঁর দু' চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখনও হোটেলের বন্ধ জানলার দিকে নিবদ্ধ। জানলার শার্সি ভেদ করে শুধু রক্তবর্ণ পুরু পর্দাটাই দেখা যাচ্ছে। ভেলভেটের জরাজীর্ণ এই পর্দাটা সম্ভবত সম্রাট লুই ফিলিপের আমলের। ফোন করে ফিরে আসার পরও ল্যুকা ইন্সপেক্টরকে একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। দু'চোখের গভীর চিন্তার ছায়া।

—চীফ আমাদের সবদিক ভেবে-চিন্তে সাবধানে এগোতে বললেন। মাত্র গত হপ্তায় একজন গোয়েন্দা নিহত হয়েছে, আবার যদি তেমন কোনও দুর্ঘটনা ঘটে ...

—দয়া করে তোমার এই বকবকানি বন্ধ কর!

—আপনার কি মনে হয় স্ট্যান দ্য কিলার ...

—এখন আমি কিছুই ভাবছি না। সকাল থেকে এই মামলাটা নিয়ে এত বেশি চিন্তা করেছি যে আমার মাথা ধরে গেছে। এখন আমি আমার আগের ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাই। আমার ধারণা, ওখানে গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে।

পাশের ঘরে সেই যুবতী মেয়েটি এখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাঁচতলার কোনও ঘর থেকে পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ানের আওয়াজ ভেসে আসছে। ভুল সুরে একই গৎ বারবার বাজিয়ে চলেছে কেউ। ওই বেসুরো আওয়াজ শুনে আপনা থেকেই মেজাজ খিঁচড়ে যায়।

—আমি নিজে ওখানে গিয়ে আসল ঘটনাটা কি স্বচক্ষে দেখে আসব ? —জানতে চাইল ল্যুকা। মেইগ্রে তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ল্যুকার দিকে তাকালেন। যেন তাঁর-ই অধস্তন এক কর্মচারী তাঁর সাহসের অভাব লক্ষ করে তাঁকে ব্যঙ্গ করছে।

—তুমি কি ভাবছ ভয় পেয়ে আমি ওখানে যেতে চাইছি না ? একটা ব্যাপার তুমি বেমালুম ভুলে যাচ্ছ, আমাদের চালে যদি সামান্য ভুল হয় তবে সুড়ুৎ করে পাখি উড়ে যাবে। আর কখনোই আমরা ওদের নাগাল পাব না। সেইজন্যেই আমি এত ইতস্তত করছি। নিদেনপক্ষে সুন্দরী যদি ওই জানলাটাও খুলে রাখতেন ...! —মাঝপথে থেমে গিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ল্যুকার দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। —আচ্ছা ... বলতো, আর কখনও তুমি মহিলাকে জানলা বন্ধ করতে দেখেছ ? মানে, অন্য কোনও পুরুষের উপস্থিতিতে ...

—না, স্যার।

—তার অর্থ হচ্ছে তোমার এখানে বসে থাকাটা তিনি কখনও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেনি।

—সম্ভবত তিনি আমাকে বোকাসোজা বুড়ো-হাবড়াদের দলে ফেলতেন।

—তা হলে জানলা বন্ধ করার মতলবটা মহিলার নিজের মাথা থেকে আসেনি। আর একজন যিনি ঘরে এসেছেন ...

—ওজেপ ?

—ওজেপ অথবা অন্য কেউ। তিনি-ই নিশ্চয় মহিলাকে জানলা বন্ধ করার কথা বলেছেন! —দ্রুতহাতে টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় চাপালেন মেইগ্রে। পাইপের আগুনটা ঝেড়ে ফেললেন অ্যাশট্রের মধ্যে।

—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন, বস্ ?

—আমাদের লোকজনদের আসার অপেক্ষা করছিল। ওই দেখ, বাসস্টপে দু'জনকে দেখা যাচ্ছে। দাঁড়ানো ট্যাক্সিগুলোর আশেপাশেও ঘোরাফেরা করছে কয়েকজন। ... আমি এখন হোটেল বোসেজুরে যাচ্ছি। যদি পাঁচমিনিটের মধ্যে নিজের হাতে ওই বন্ধ জানলাটা না খুলি, তবে তুমি সদলবলে ভেতরে ঢুকে পড়বে।

—আপনার রিভলবারটা সঙ্গে আছে তো ?

মিনিটখানেকের মধ্যেই মেইগ্রেকে দ্রুতপায়ে রাস্তা পেরুতে দেখা গেল। গোয়েন্দা জাঁভীয়ে ওয়েটারের পোশাক পরে ঝাড়ন দিয়ে টেবিল ঝাড়ছিল। বস্-এর দিকে নজর পড়ায় তার হাতের কাজ আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

ক্ষণিক বিরতির পর মেইগ্রে নিজের হাতে তেতলার ওই বন্ধ জানলাটা খুলে ফেললেন। তারপর ইঙ্গিতে ল্যুকাকে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার ইঙ্গিত দিলেন।

ফিল্ড-গ্লাসে যেটুকু ধরা পড়ল তাতে ল্যুকা দেখল ঘরের মধ্যে ইন্সপেক্টর ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। তড়িঘড়ি করে ও অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে সিঁড়ি পেরিয়ে হোটেল বোসেজুরের তিনতলার ঘরে এসে পৌঁছল। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল ওকে। ঠিক ওর পায়ের সামনেই এক মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে। হত্যাকারী যেন নিজের কৃতকর্মের স্বাক্ষর রেখে গেছে মৃতদেহের ওপর। স্ট্যানের অন্যান্য শিকারের মতো এই মহিলার কণ্ঠনালীও কেটে দু ফাঁক করে দেওয়া হয়েছে। গলগলিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে সেই ক্ষতস্থান থেকে।

উজ্জ্বল রং দিয়ে আঁকা যে ছবিটা দেওয়ালে টাঙানো ছিল, খুঁটিয়ে দেখার পর বোঝা গেল সেটা ওলগার-ই একটা পোর্ট্রেট। তবে অনেক কম বয়সের। অন্ত তপক্ষে বছর দশেক আগের তো বটেই। দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেইগ্রে আবার মেঝেয় পড়ে থাকা রক্তাক্ত মৃতদেহটার দিকে ফিরে

তাকালেন। তাঁকে দেখে মনে হল তিনি যেন এমনই এক মাতাল, যার হাত থেকে ব্রান্ডির বোতল পড়ে গিয়ে চুরমার হয়েছে।

—এটা আপনার ওই পোলিশের-ই কীর্তি ?

মেইগ্রে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন। মানসিক বিভ্রান্তির ভাবটা এখনও তিনি পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

—আমি কি আমাদের সশস্ত্র রক্ষী বাহিনীর কাছে ওজেপের চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলব, ভদ্রলোক যাতে হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারেন সেদিকে তারা যেন কড়া নজর রাখে ? তাছাড়া হোটেলের ছাদেও আমি একজনকে পাহারায় রাখতে চাই। ওজেপ যদি ছাদ টপকে পালাবেন বলে ভেবে থাকেন ...

—হ্যাঁ, বলে যাও।

—আমি কি চীফকে একটা খবর দেব ?

—অবশ্যই, এই মুহূর্তে।

মেইগ্রের এইরকম মানসিক অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। ল্যুকা অবশ্য তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করল। ইন্সপেক্টর যদিও নিজের মুখে স্বীকার করলেন, তিনি একটা ভীষণ-রকম বোকার মতো কাজ করে বসেছেন। কিন্তু এখন তিনি যা করছেন সেটাকে মুর্খামির চূড়ান্ত বললেও কম বলা হয়। তিনি এক বিশাল পুলিশ-বাহিনী এনে জড় করেছেন, আসল অপরাধটা যার আগেই ঘটে গেছে। এমন কী তাঁর চোখের সামনেই যেন খুনটা ঘটল। তাঁর নির্দেশেই ওজেপ এই হোটেলে এসে হাজির হয়েছিলেন।

—ইতিমধ্যে দলের আর কেউ যদি ফিরে আসে আমি কি গ্রেপ্তার করব ?

মেইগ্রে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ কি না বোঝা গেল না।

—মেইগ্রে কোথায় ? —গাড়ি থেকে নামতে নামতেই ল্যুকার দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন চীফ।

—তেতলার উনিশ নম্বর ঘরে। হোটেলের আর কেউ এখনও আসল ঘটনার কথা কিছু টের পায়নি।

কয়েক মুহূর্ত বাদে চীফের সঙ্গে মেইগ্রের দেখা হল। মৃতদেহটা থেকে হাত দু-তিন দূরে ঘরের মাঝ-বরাবর একটা চেয়ারে স্থির হয়ে বসে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি।

—ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে আমরা এখন এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়েছি! এবং যে লোকটা তোমাক সাহায্য করতে এত উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল, আসলে সে-ই হচ্ছে এই সমস্ত লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের নায়ক। তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে, মেইগ্রে, ওজেপকে এতখানি বিশ্বাস করা তোমার মোটেই উচিত হয়নি। গোড়া থেকেই ওর হাবভাব চাল-চলন এতই সন্দেহজনক ছিল যে ...

মেইগ্রের ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠল। সারা মুখে আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠ চাপ।

—তোমার কি মনে হয় ও এখনও এই হোটেল ছেড়ে পালাতে পারেনি ?

—সে-বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। —জোরের সঙ্গে জবাব দিলেন মেইগ্রে।

—তুমি তো এই হোটেলটা এখনও তল্লাশ করে দেখনি ?

—না, এখনও দেখা হয়নি।

—শয়তানটা কি এত সহজে ধরা দেবে বলে তোমার মনে হয় ?

মেইগ্রে এবার ধীরে ধীরে জানলা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে চীপের মুখের দিকে তাকালেন। —আমার হিসেবে যদি কিছু ভুল হয়, তা হলে ধরা পড়ার আগে ওজেপ এলোপাথাড়িভাবে গুলি চালিয়ে যতজনকে সম্ভব খুন করার চেষ্টা করবে। আর আমি যদি ভুল না করে থাকি তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। সবকিছু তার নিজের স্বাভাবিক নিয়মেই চলবে।

—তোমার কথাবার্তা আমার কাছে হেঁয়ালির মতো ঠেকছে!

—আমি আপনাকে আবার বলছি, চীফ, আমার হিসেবে ভুল হতে পারে। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। তেমন হলে আমি আপনার ক্ষমাপ্রার্থী। কারণ সেক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা খুবই ঘোরাল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এই মামলায় এমন কিছু একটা ব্যাপার আছে যেটাকে আমি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ঠিকমতো মিলিয়ে নিতে পারছি না। আমি নিজেও সেটা স্পষ্ট বুঝত পারছি। ওজেপ যদি স্ট্যান হন তা হলে কেন-ই বা তিনি ..., মাঝপথে থেমে গেলেন মেইগ্রে।

—তুমি কি এখন এই ঘরেই থাকবে ?

—হ্যাঁ, পরবর্তী নির্দেশ না-আসা পর্যন্ত।

—তাহ"ল আমি নীচে গিয়ে দেখছি আমার লোকেরা কী করছে ?

ইতিমধ্যে স্পিনজি ধরা পড়েছিল। ল্যুকার অনুমানই ঠিক। সুযোগ বুঝে ও একলা সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। যখন ওকে জানানো হল যে মারা গেছে ওর মুখ-চোখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তবে ওজেপের নাম শুনে ওর মধ্যে কোনও ভাবান্তর দেখা দিল না।

আধঘণ্টা বাদে একচোখোকেও গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নগর-পরিভ্রমণ শেষে ও তখন হোটেলে ফিরছিল। হোটেল চত্বরের মধ্যেই ওকে গ্রেপ্তার করা হল। তখন ওর তরফ থেকে বিশেষ কোনও বাধা আসেনি। তবে স্বর্ণকেশীর মৃত্যুর খবর শুনেই ও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। হাতকড়ি ভেঙে ফেলে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত বেগে ওপরে ওঠার চেষ্টা করেছিল।

—কে ?...কে খুন কেরছে ?—চেঁচিয়ে উঠেছিল ও।—নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কেউ ?

—না, ওজেপ ওরফে স্ট্যান দ্য কিলার।

হত্যাকারীর নামটা কানে যাওয়া মাত্রই ওর সব লম্ফঝম্প নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিমূঢ়চিত্তে বার কয়েক শুধু বিড়বিড় করল —ওজেপ ? ... ওজেপ ?

—তোমাদের বস্-এর আসল নামটা তুমি জানো না, একথা নিশ্চয় তুমি আমাকে বলতে চাচ্ছ না ? —বারান্দায় দাঁড়িয়েই একচোখোকে জেরা করছিলেন পুলিশ চীফ।

সে এ প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না। তবে তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে ক্ষীণ একটা হাসির আভা ফুটে উঠল।

এরপরে দলের আর একজন ধরা পড়ল। সে হচ্ছে কেমিস্ট। সব প্রশ্নেরই জবাব দিল সে। যদিও তার চোখে-মুখে বিভ্রান্তির ছায়া নজর এড়ায় না। সে ওই মহিলার আসল পরিচয় কিছুই জানে না। এমন কী ওজেপ বা স্ট্যান কারুর নাম-ই সে শোনেনি।

মেইগ্রে তখনও পর্যন্ত তিনতলার ওই ঘরের মধ্যেই বসেছিলেন। তাঁর সামনেই সুন্দরী মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহটা পড়েছিল। সমগ্র ঘটনাটার মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বেড়চ্ছিলেন তিনি। এমন সময় ল্যুকা এসে খবর দিল দাড়িওয়ালাকেও বিনা প্রতিরোধে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রথমে খানিকটা গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করলেও শেষমেশ একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

মেইগ্রে তখন গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন মনে মনে। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন—একটা ব্যাপার তোমার নিশ্চয় নজরে পড়েছে লুকা, এ-পর্যন্ত যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হযেছে তাদের কেউ-ই বিশেষ কোনও বাধার সৃষ্টি করেনি। কিন্তু স্ট্যানের মতো কেউ যদি ...

—ওজেপ-ই তো আসলে স্ট্যান!

—তাঁর কি কোনও হদিশ পেয়েছ ?

—না, এখনও পর্যন্ত পাইনি। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে দলের আর সকলকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত আমরা হোটেলের মধ্যে ব্যাপকভাবে খানা-তল্লাশের কাজ শুরু করতে চাইছি না। আমাদের লোকেরা নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তারা যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

—শোন ল্যুকা, ...

সার্জেন্ট ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল। মেইগ্রের জন্যে তার মনে এক ধরনের করুণার সঞ্চার হল। মেইগ্রে তখনও নিজের কথার খেই ধরে বলে চললেন—একচোখো স্ট্যান নয়, স্পিনিজ বা দাড়িমুখোও স্ট্যান নয়। কিন্তু আমি স্থির নিশ্চিত যে, স্ট্যান এই দলেই থাকত। সে-ই এই দলের মধ্যমণি। —ল্যুকা কোনও মন্তব্য করল না। ইন্সপেক্টর এখন এইভাবে একনাগাড়ে বকে চলবেন। —ওজেপ যদি স্ট্যান হন, তবে তিনি তাঁর-ই দলের একজনকে খুন করতে গেলেন কেন ? আর তিনি যদি স্ট্যান না হন ...

মাঝপথে থেমে গিয়ে হঠাৎই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মেইগ্রে। তারপর দৃঢ়পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ওলগার রঙিন ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দু'হাত দিয়ে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনলেন ছবিটা। ফ্রেমটা খুলে আসল ছবিটা এগিয়ে দিলেন ল্যুকার দিকে। ছবিটা আদতে অ্যামেরিকান ডিটেকটিভ ম্যাগাজিনের একটা মলাট। ছবির ওপরে এবং নীচের লেখাগুলো ফ্রেমের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। সবটাই ইংরেজিতে লেখা। এই বিদেশী ভাষাটা লুকার আয়ত্তে ছিল খানিকটা, তাই পড়তে বিশেষ অসুবিধে হল না। ছবির ওপরে মোটা মোটা হরফে লেখা ঃ সত্য ঘটনা-মূলক ডিকেটটিভ কাহিনী। ছবির নীচে ঈষৎ ছোট টাইপে তরুণীর আসল পরিচয় ঃ দুর্ধর্ষ ডাকাত দলের নেত্রী সুন্দরী পোলিশ রমণী।

মেইগ্রের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। —এ সমস্তই হচ্ছে অসার দম্ভের ফল। ওরা নিজেদের সামলে রাখতে পারেনি। বুকস্টলে দেখার পরই পত্রিকাটা কিনে এনেছিল। মহিলাও সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা কেটে নিয়ে ফ্রেমে আটকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলেন।

একটু থেমে নতুন করে পাইপ ধরালেন মেইগ্রে। —প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল, ইতিপূর্বে ওই মুখ আমি যেন কোথায় দেখেছি। আমার অবচেতন মনে ওই মামলাটার কথাও উঁকিঝুঁকি মারছিল। পত্র-পত্রিকায় যখন ওই মামলার খবরাখবর বেরুচ্ছিল তখন তার কিছু কাটিংও আমি জোগাড় করেছিলাম। এর মধ্যে নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই। বছর পাঁচেক আগে পশ্চিম আমেরিকার মাঝ-বরাবার একদল খুনে ডাকাত এইভাবে নির্জন খামারবাড়ি আক্রমণ করত। আক্রান্তদের প্রত্যেকেরই শ্বাসনালী কেটে দিয়ে আসত। আর এই দলের নেতৃত্বে থাকতেন এক সুন্দরী তরুণী। অ্যামেরিকান প্রেস তার একটা ছবিও জোগাড় করেছিল।

—তা হলে স্ট্যান ... ?

—তিনি-ই হচ্ছেন ওলগা। এ-ব্যাপারে আমি প্রায় নিশ্চিত। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এ-সম্পর্কে সব সন্দেহের নিরসন ঘটবে। আমি এখন অফিসে যাচ্ছি। ল্যুকা, তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে ?

—কিন্তু আমাদের ওজেপ ? —মেইগ্রের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে প্রশ্ন করল ল্যুকা।

—হ্যাঁ, ওজেপের সম্পর্কেই অএখন আমি বিস্তারিত ভাবে খোঁজখবর নেব। মনে হচ্ছে, তাঁর ব্যাপারেও হয়তো কিছু জানতে পারব। তিনি যদি সত্যিই ওলগাকে খুন করেন তার পেছনেও নিশ্চয় গুরুতর কিছু কারণ থাকবে। শোনো ল্যুকা, আমি যখন ভদ্রলোককে এই দলটার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললাম, তিনি এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু যখন একা এই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললাম, তখন আমার সেই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান

করলেন। অবশেষে অনেক জোরজবরদস্তির পর কোনওরকমে রাজি করানো গেল তাঁকে। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, দলের আর কারুর সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও এই মহিলার সঙ্গে বেশ ভালই জান-পহচান ছিল।

কোনওকিছুই সুনির্দিষ্ট ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা মেইগ্রের স্বভাব বহির্ভূত। তাই পেপার-কাটিংগুলো খুঁজে পেতে আধঘণ্টার ওপর সময় লাগল। —এটা পড়ে দেখো। অ্যামেরিকান প্রেস তাদের পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখে না। শুধু ওপরের হেডিংটা পড়লেই পাঠকদের গায়ের রক্ত চনমন করে উঠবে। ... নারীরূপী শয়তান ... নৃশংস পোলিশ তরুণ ... তেইশ বছর বয়সেই দুর্ধর্ষ খুনে-গুণ্ডা বাহিনীর নেত্রী। ...

শিরোনামের নীচে এই পোলিশ যুবতীর লোমহর্ষক কীর্তিকাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ। আঠারো বছর বয়সেই স্টেফ্যানি পলিন্‌ৎস্কাজার নাম ওয়ারশ পুলিশের কাছে রীতিমতো সুপরিচিত। বেশ কয়েকটা ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল যুবতী। তবে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কিছু ছিল না। এই সময় এক যুবকের সঙ্গে তরুণীর পরিচয় হয়। বিয়েও হয় দুজনের। বিয়ের ফলে একটা ছেলে হয়েছিল তাদের। যুবকটির পরামর্শে সৎভাবে জীবনযাপন শুরু করছিল মেয়েটি। আশা করা গিয়েছিল মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র শুধরে যাবে। একদিন যুবকটি তার কাজ শেষ করে বাসায় ফিরে এসে দেখল তার সুন্দরী স্ত্রী বেপাত্তা হয়ে গেছে। তাদের একমাত্র শিশুপুত্র মৃত অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। তার শ্বাসনালী ধারাল কোনও অস্ত্র দিয়ে কেটে দুফাঁক করে দেওয়া হয়েছে। —এই হতভাগ্য যুবকটি কে জানো ?

—ওজেপ ?

—এই দেখো, এখানে একটা ছবিও ছাপা হয়েছিল তাঁর। ওজেপের চেহারার সঙ্গে অনেক মিল আছে ছবিটার। তা হলে বোঝা যাচ্ছে স্টেফ্যানির-ই ডাকনাম স্ট্যান। অ্যামেরিকান জেল থেকে সে কী করে পালিয়ে এল সে-তথ্য আমার অজানা। তবে এই স্ট্যান-ই যে এখন ফ্রান্সে এসে আস্তানা গেড়েছে, এবং নতুন করে একটা খুনে-গুণ্ডার দল তৈরি করে পুরোদমে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর স্বামী কাগজ পড়ে জানতে পেরেছিলেন যে মহিলা এখন প্যারিসেই রয়েছেন, আর পুলিশ তাঁর খোঁজ করছে। ভদ্রলোক কি আবার তাঁর স্ত্রীর চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করছিলেন ? আমার অবশ্য তা মনে হয় না। তিনি চেয়েছিলেন যে দানবী তাঁর একমাত্র শিশুপুত্রকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছে তার শাস্তি হোক। সেই কারণেই তিনি আমাকে সব-রকমভাবে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কেননা একলা কাজ করার মতো সাহস তাঁর ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন পুলিশ তাঁর পেছনে থাকুক। এবং আজ বিকেলে আমি যখন তাঁকে বাধ্য করলাম ...

একটু থেমে দম নিলেন মেইগ্রে। —প্রাক্তন স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর কী-ই বা করার ছিল বেচারির! হয় মরো, না-হয় মারো। ... আর ... আর আমার কি মনে হয় জানো ? এই হোটেলেই কোথাও ওরা থাকে কমবেশি আহত অবস্থায় খুঁজে পাবে। ইতিপূর্বে দু-দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। তৃতীয়বারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটলে আমি খুব একটা আশ্চর্য হব না। —ভেজানো দরজা ঠেলে ভতরে ঢুকতে-ঢুকতে চীফ বললেন—পাঁচতলার চিলেকোঠা থেকে ওজেপের ঝুলন্ত মৃদদেহটা পুলিশ অবশেষে উদ্ধার করেছে।

—তা হলে শেষ পর্যন্ত তিনি সার্থক হলেন! —মেইগ্রের বুক ঠেলে একটা চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। —ভদ্রলোক সত্যিই হতভাগ্য।

—ওর এই পরিণতিতে তুমি খুবই দুঃখ পেয়েছ মনে হচ্ছে ?

—তা তো বটেই! বিশেষ করে তাঁর এই পরিণতির জন্যে আমিও অংশত দায়ী। ... আমি সত্যিই খুব বেশি ভুড়িয়ে যাচ্চি কি না বলতে পারি না, তবে এই মামলার সমাধান খুঁজে পেতে আমার অযথা অনেকটা সময় লেগেছে।

—কীসের সমাধান ? —সন্ধিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করলেন চীফ।

—সমস্ত মামলাটার একটা সুষ্ঠু সমাধান। —হাসিমুখে লুকা বলল। ইন্সপেক্টর যাবতীয় রহস্যের মীমাংসা করে দিয়েছেন।

—তাই নাকি মেইগ্রে ?

—হ্যাঁ ... তাই। আপনি তো জানেন জীবনে আমি কখনও এত বেশি অস্থির হয়ে উঠিনি। আমি জানতাম, সমাধান আমার নাগালের মধ্যেই রয়েছে, কেবল একটিমাত্র সঙ্কেতের অপেক্ষা। .... কিন্তু আপনারা সকলে মিলে আমার চারপাশে এমনভাবে গুঞ্জন শুরু করলেন, দলটাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে এমন ব্যতিব্যস্ত করতে লাগলেন ... তারপর ওই অ্যামেরিকান ডিটেকটিভ ম্যাগাজিন আর তার কভারে মহিলার ছবিটার কথাও আমার মনে পড়ল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাইপে নতুন করে তামাক ভরলেন মেইগ্রে। ল্যুকার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে তাতে আগুন ধরালেন। বিকেলে উত্তেজনার আধিক্যে বারবার পাইপ ধরাতে হয়েছিল তাঁকে, তাই তাঁর নিজের দেশলাইটা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

—এখন সবে সাতটা। —চীপের দিকে তাকিয়ে মেইগ্রে হেসে বললেন এক দিন আমাদের ওপর দিয়ে যা ধকল গেছে সে আর কহতব্য নয়। তাই আমার প্রস্তাব হচ্ছে কোনও বারে গিয়ে তিনজনে যদি তিনটে বীয়ার নিয়ে বসতাম, ... অবশ্য তার আগে ল্যুকাকে ওই দাড়িগোঁফের জঙ্গল পরিষ্কার করে ফোপদুরস্ত হয়ে আসতে হবে।

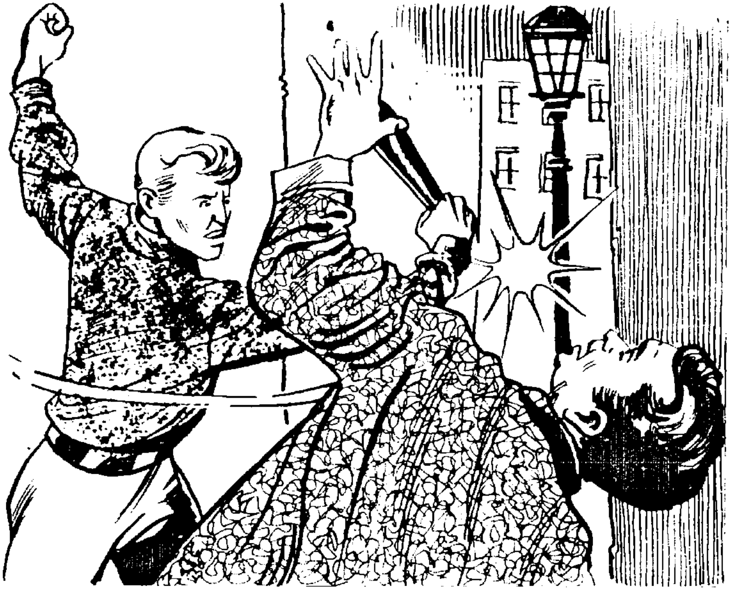

অদৃষ্টলিপি

(ইট টেকস্ টু)

সিরিল হেয়ার

খুন-খারাপির ব্যাপারে নিদেনপক্ষে দু'জনের দরকার পড়ে। একজন হত্যাকারী, দ্বিতীয়জন ভাগ্যহত ব্যক্তি। হত্যাকারীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে হরেকরকম গুরুগম্ভীর আলোচনা হামেশাই শুনতে পাওয়া যায়। তাবড়-তাবড় বইও লেখা হয়েছে এ-বিষয়ে। কিন্তু নিহত ব্যক্তির মানসিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে খুব কমই চিন্তা—ভাবনা করা হয়। যদিও সময়-সময় সেটাই আরও বেশি চিত্তা-কর্ষক হয়ে দাঁড়ায়

টেড ব্রাকলের হাতে খুন-হওয়া ডেরেক ওয়ালটনও এমনই এক চরিত্র। ডিসেম্বরের এক হিমেল সন্ধেয় মে ফেয়ারের বৌলটার মিউজে খুন হয় ওয়ালটন। ওয়ালটন ছিল বেশ শক্ত-সমর্থ যুবক। লম্বায় পাঁচফুট আটইঞ্চি। মাথার চুলগুলো কালচে আর চোখের মণিদুটো হালকা বাদামী। নাকের নীচে টুথব্রাশের মতো একচিলতে গোঁফও ছিল তার। এবং পায়ের দোষ থাকার ফলে সামান্য একটু খুঁড়িয়ে হাঁটত। ম্যালার্ডের জুয়েলারি দোকানে চাকরি করত ওয়ালটন। বন্ড স্ট্রীটের ঠিক বিপরীত দিকেই ম্যালার্ডের দোকান। দোকানটা আয়তনে ছোট

ওরও ব্যবসাপত্তর বেশ রমরমিয়ে চলছিল। খুন হবার সময় ওয়ালটনের পকেটে হীরের প্যাকেটও ছিল একটা। ওর মালিক-ই প্যাকেটটা ওকে দিয়েছিল বার্মিংহ্যামে কারিগরদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। তাই ওয়ালটনের খুন হবার পেছনে মূল্যবান এই হীরেগুলো প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু ওয়ালটন যদি আর একটু মোটাসোটা হত, বা ওর চোখের মণিদুটো যদি নীল হত, কিংবা উচ্চতায় ও যদি পাঁচ ফুট ন ইঞ্চির বেশি হত তা হলে ও ঠিক ওই সময় ওইভাবে খুন হত না। কেননা ব্রাকলে লোকটা ছিল খুবই সাবধানী। ওয়ালটনের এই শোচনীয় পরিণতির পেছনে আরও একটা গোপন কারণ নিহিত ছিল। রেসে ক্রমাগত হারতে হারতে একবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল বেচারি। দেনায় ওর মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গিয়েছিল।

ওয়ালটন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কোনও তথ্যই ব্রাকলের অজ্ঞাত ছিল না। বিগত কয়েক মাস ধরে ব্রাকলে তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল। তার চাল-চলন, তার বাচন-ভঙ্গি, তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, এমন কী তার পোশাক-আশাক, সবদিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ব্রাকলের। প্রেমিকা যেমন তার প্রেমাস্পদের প্রতিটি কাজকর্ম গভীর আবেগের সঙ্গে লক্ষ্য করে থাকে, ব্রাকলের ব্যাপারটাও প্রায় সেইরকম। ওয়ালটন কখন দোকানে যায়, কখন দোকান থেকে বেরিয়ে আসে, এই সমস্ত খুঁটিনাটি ঘটনা একবারে মুখস্থ হয়েগিয়েছিল ওর। ওয়েস্ট লন্ডনের কোথায় সে থাকে, কোন পানশালায় নিয়মিত যাতায়াত করে, কোন বুকির কাছে বাজি ধরে, কোন-কোন মেয়ের সঙ্গে সে লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম করে বেড়ায়, তাও ব্রাকলে জানত। ওয়ালটনের বাপ-মা যেখানে বাস করে, সেই ব্রিমিংহ্যামেও বার কয়েক ঘুরে এসেছে ও। এই ব্রিমিংহ্যামেরই কয়েকজন দক্ষ কারিগর বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারে মূল্যবান পাথর বসানোর কাজ করে। এবং এই কারিগরদের হাতের কাজের সুবাদেই নিকোলাস ম্যালার্ডের জুয়েলারি দোকনের এত রমরমা।

বৌলটার মিউজের এক অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত কথাই চিন্তা করছিল ব্রাকলে। ওয়ালটনের মগজের মধ্যে এখন কোন মতলব ঘুরপাক খাচ্ছে, এই একটি মাত্র তথ্য ছাড়া ওর সম্পর্কে আর কোনও কিছুই ব্রাকলের অজ্ঞাত নেই। তবে এই মুহূর্তে সেটা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। শিকারী কি অসতর্ক প্রাণের দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়ার আগে তার মনের কথা চিন্তা করে!

তবে আজ যেন ওয়ালটন দোকান ছেড়ে বেরুতে একটু বেশি দেরি করছে। নিজের হাত-ঘড়ির দিকে ব্রাকলে তাকিয়ে দেখল একপলক। ওর ভ্রূ জোড়া কুঞ্চিত হল। এখন যে কনস্টেবল এই অঞ্চল পাহারা দিচ্ছে, এ রাস্তার শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পাকা দশ মিনিট সময় লাগবে তার। ব্রাকলে মনস্থির করল, বড়জোর আর দু মিনিট অপেক্ষা করবে ও। ইতিমধ্যে ওয়ালটনের আবির্ভাব না ঘটলে আজকের মতো মুলতুবি রাখবে কাজটা। কেননা, তা হলে বিপদের সম্ভাবনা খুবই বেশি হয়ে দাঁড়াবে। তখন আবার অন্যদিন অন্য কোনও সুযোগের

সন্ধানে থাকতে হবে। সুযোগ অবশ্য আবার আসবে, এবং ও তারজন্যে অপেক্ষা করতেও রাজি, তবে আজকের এই পরিবেশটা ওর কাজ হাসিলের পক্ষে খুবই উপযুক্ত ছিল। এমন সুযোগ হাতছাড়া হওয়া সত্যিই খুব আক্ষেপের কারণ। শুধু জুয়েলারি দোকানটাই নয়, এ অঞ্চলের সব দোকানের কর্মচারিরাই প্রায় আধঘণ্টা আগে যে যার নিজের বাসার পথে রওনা হয়েছে। ধীরে ধীরে হালকা একটা কুয়াশাও ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে। এতক্ষণ ধরে দোকানে বসে কী করছে ওয়ালটন!

দু মিনিটের পর আরও তিরিশ সেকেন্ড কেটে গেল, তখনই সেই বহু-প্রতিক্ষীত পদধ্বনি ব্রাকলের কানে এসে পৌঁছল। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে ফেন্টিম্রান স্ট্রীটে ম্যালার্ডের জুয়েলারি দোকানের পেছন দিকের দরজা খোলার শব্দ হল। দরজায় চাবি লাগাবার শব্দ শুনতে পেল ব্রাকলে। প্রত্যেক দিন সবার শেষে এই ভাবেই পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে ওয়ালটন। বাইরে এসেও কয়েকমুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। ব্রাকলে অবাক হল মনে মনে। আজ যেন পদে-পদেই দৈনন্দিন রুটিন থেকে সরে যাচ্ছে লোকটা। তাই ব্রাকলেরও সব হিসেবের গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। আজ কি শর্টকাট রাস্তা না ধরে বন্ড স্ট্রীট দিয়ে ঘুরে যাবে বলে ঠিক করেছে ? না, এবার ওর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। চিরাচরিত পথ ধরেই এগিয়ে আসছে ও। একটা দোকানের দরজার আড়ালে সরে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে ব্রাকলের মনে হল, স্বাভাবিকের চেয়ে একটু দ্রুতগতিতেই আজ হেঁটে আসছে ওয়ালটন। ব্রাকলের পক্ষে এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা, কারণ সবকিছুই নিখুঁতভাবে ছক-করা। এর মধ্যে সময়ের ভূমিকাটাই মুখ্য। এই সময় হিসেব করেই ও এতদিন ধরে মনে মনে রিহের্সাল দিয়ে রেখেছে। এখন শেষ মুহূর্তে যদি তার কোন হেরফের ঘটাতে হয় তবে ঝুঁকির একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। এই ঝুঁকিতেই ব্রাকলের যত অনীহা। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ও এমন একটা মতলব বের করেছে যার মধ্যে ঝুকির কোনও অস্তিত্ব নেই।

অবশ্য পুরোপুরি ভেঙে পড়ার মতো এখনও তেমন কিছু ঘটেনি। সব ব্যাপারটা হিসেব-মাফিকই ঘটে চলেছে। ওয়ালটন যখন দরজার আড়ালে লুকিয়ে থেকে ব্রাকলেকে অতিক্রম করে কয়েক পা সামনের দিকে এগিয়ে গেল, ব্রাকলে তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল চারদিক। আশপাশে ওরা দু'জন ছাড়া আর কোনও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। দ্রুতপায়ে কিন্তু নিঃশব্দে ওয়ালটনের একেবারে পেছনে চলে এল ও। তারপর রবারের হাতল লাগানো স্টীলের তৈরি ভারী মুগুরটা দিয়ে তার ডান দিকের কানের নীচে সজোরে আঘাত করল। ঠিক এই জায়গাটাতেই ও আঘাত করতে চেয়েছিল। ওয়ালটনের গলা দিয়ে সামান্য একটা গোঙানির শব্দ পর্যন্ত বেরুল না। ওর বিশাল শরীরটা টলমল করতে-করতে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

কিন্তু ব্রাকলে ওকে পড়তে দিল না। তার আগেই এগিয়ে গিয়ে শক্ত হাতে ধরে ফেলল ওয়ালটনকে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে প্রাণহীন দেহটা ও ধরে রাখল শক্ত করে, তারপর একটা ঝাঁকি দিয়ে সেটা নিজের কাঁধের ওপর তুলে নিল। অবশেষে যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই এগিয়ে চলল দ্রুতপায়ে। সমস্ত ঘটনাটা ঘটে যেতে দশ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগল না। শব্দও হল না তেমন কিছু। শুধু মুগুরের আঘাতের অস্পষ্ট আওয়াজ, আর ওয়ালটনের সঙ্গে মাঝারি সাইজের যে স্যুটকেসটা ছিল সেটা হাত থেকে খসে পড়ার দরুন খড়খড়ে একটা শব্দ শোনা গেল। ওয়ালটনের টুপিটাও খসে পড়ে ছিল ওর মাথা থেকে। অন্ধকার গলির মধ্যে স্যুটকেস আর টুপিটাই কেবল এই নৃশংস ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে রইল। দু-চার মুহূর্ত পরে ব্রাকলে আবার ফিরে এসে সে দুটোও নিয়ে গেল। সঙ্গে করে। সমগ্র বৌলটার মিউজ এখন নির্জনে পড়ে থাকা বিষাদবিধুর স্মৃতি-স্তম্ভের মতো খাঁ-খাঁ করতে লাগল। তার বুকের গভীরে এখন কবরের হিমেল নীরবতা।

নিজের ভাড়া-করা গ্যারেজে ঢুকে ব্রাকলে প্রথমে দরজাটা ভেজিয়ে দিল নিঃশব্দে। এতখানি পরিশ্রমের ফলে ওর শ্বাসপ্রশ্বাসও পড়তে লাগল দ্রুতলয়ে। তবে উত্তেজনার আধিক্যে ও মেজাজ হারাল না। একটা ইলেকট্রিক টর্চের সাহায্যে দ্রুতহাতে কাজ শুরু করে দিল। এই গ্যারেজটা ও নিজের নামে ভাড়া নিয়েছে। এখানে মালবাহী যে ভ্যানটা আছে সেটার মালিক ও নিজে। ভ্যানের পেছন দিকে একটা তক্তার ওপর কম্বল বিছিয়ে শুইয়ে রাখা ছিল মৃতদেহটা। স্টীলের ভারী মুগুরটাও তার পাশেই রাখা ছিল।

রক্তপাত প্রায় হয়নি বলা চলে। তবু সামান্য যেটুকু রক্ত বেরিয়েছে সেটা যেন শুধু কম্বলেই লেগে থাকে, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি ছিল ওর। ব্রাকলে এখন দ্রুতহাতে মৃত ওয়ালটনের পকেট হাতড়াতে শুরু করল। যেমন আশা করেছিল, হীরের প্যাকেটটা কোটের ভেতর দিকের পকেট থেকেই পাওয়া গেল। অন্য একটা পকেট থেকে বেরুল ওয়ালটনের মানিব্যাগ। তারমধ্যে ছিল পরিচয়-পত্র, এক পাউন্ডের কয়েকটা নোট, আর কিছু ব্যক্তিগত কাগজপত্র। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপারটা ঘটল হিপ-পকেটে হাত দেবার পর। একটা সিগারেট-কেসের মধ্যে ঠাসা ছিল পাঁচ আর দশ পাউন্ড মূল্যের একগুচ্ছ কারেন্সি নোট। ঘটনা একেবারেই অভাবিত। ব্রাকলে অবশ্য গুনে দেখল না, তবে নোটের সংখ্যা যে শ খানেকের কাছ বরাবর তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। অন্ধকারের মধ্যেই এক ঝলক হাসি ফুটে উঠল ব্রাকেলের ঠোঁটের ফাঁকে। অন্যসব কাজের চাপে বিগত দু-হপ্তা ও রেসের মাঠে ওয়ালটনকে অনুসরণ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে বরাতটা নিশ্চয় ওর খুলে গিয়েছিল। নোটে-ঠাসা সিগারেট-কেসটা নিজের পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে মনে মনে চিন্তা করল ব্রাকলে। তারপর মৃত ব্যক্তির আপাদ-মস্তক খুঁটিয়ে দেখল ভাল করে।

সব দেখেশুনে ব্রাকলে বেশ খুশিখুশি হয়ে উঠল। অন্যান্য দিনের মতো আজও সেই একই পোশাক পরে কাজে বেরিয়েছিল ওয়ালটন। ব্রাকলের গায়েও এই একই পোশাক। ব্রাকলের কাঁধ অবশ্য ওয়ালটনের মতো অত চওড়া নয়। তাই দুয়ের মধ্যে সমতা আনার জন্যে ওভারকোটের নীচে পুরু প্যাড লাগাতে হয়েছে তাকে। লম্বায় ওয়ালটনের চেয়ে ও ইঞ্চিখানেক খাটো। এই ফারাকটা যাতে কেউ বুঝতে না পারে সেইজন্যে অর্ডার দিয়ে বিশেষ ডিজাইনের জুতো তৈরি করিয়েছে ও। চুলেও কলপ লাগাতে হয়েছে সামান্য। বেশ হপ্তাকয়েকের চেষ্টায় ওয়ালটনের আদলে একটা গোঁফ বানিয়ে নিয়েছে নাকের নীচে।

বাইরের লোক এক ঝলক তাকিয়ে দেখলে এখন দু'জনের মধ্যে চট করে কোনও ফারাক খুঁজে পাবে না। বন্ড স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে যে ছেলেটা সংবাদপত্র ফেরি করে সেও কিছু বুঝতে পারল না। প্রত্যেকদিন ওয়ালটন যে কাগজ কিনে বাসায় ফেরে সেই কাগজটাই এগিয়ে দিল ব্রাকলের দিকে। সৌভাগ্যক্রমে একজন পুলিশও তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। সংবাদপত্র বিক্রেতার মনে না থাকলেও পুলিশ কর্মচারীটি নিশ্চয় ঘটনাটা ভুলে যাবে না। ওয়ালটন যে বন্ড স্ট্রীটে উপস্থিত ছিল সেটা এখন দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। সে যে বন্ড স্ট্রীট থেকে সোজাসুজি ব্রিমিংহ্যামের দিকে রওনা হয়েছিল, এখন সেই নজিরটাই সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে।

এই জরুরি মুহূর্তে একটা খালি ট্যাক্সিরও দর্শন পাওয়া গেল। গাড়িতে উঠতে-উঠতেই ব্রাকলে ড্রাইভারকে ইউস্টনে পৌঁছে দিতে বলল। এমনভাবে কথাটা বলল যাতে সেটা পাহারাদার কনস্টেবলেরও কানে গিয়ে পৌঁছয়। এমন কী আরও বেশি নিশ্চিত হবার জন্যে, ড্রাইভার তাকে ব্রিমিংহ্যামে যাবার ছ'টা পঞ্চান্নর ট্রেন ধরিয়ে দিতে পারবে কি না সে বিষয়েও প্রশ্ন করল ব্যস্ত কণ্ঠে। ড্রাইভারের আশ্বাস পেয়ে ওর গলা দিয়ে স্বস্তি-সূচক শব্দও বেরিয়ে এল একটা।

ব্রিমিংহ্যামে যাবার জন্যে ওয়ালটন সব সময় ছ'টা পঞ্চান্নর গাড়িটাই বেছে নেয়, এবং মালিকের পয়সায় প্রথম শ্রেণীর কামরাতেই ও যাতায়াত করে থাকে। ব্রাকলেও তাই করল। স্টেশনে পৌঁছে অকারণেই নিজের হাঁটা-চলার মধ্যে ও একটু ব্যস্ততার ভাব ফুটিয়ে তুলল। যে কুলিটা ওর স্যুটকেস ট্রেনে তুলে দিল তাকেও বকশিস দিল বেশি করে। কুলিটা যাতে ওকে বিশেভাবে মনে রাখে শুধুমাত্র এই আশায়। রেস্তোরাঁ-কারেই নিয়মিত ডিনার সারে ওয়ালটন। এই ব্যাপারটায় ব্রাকলের মনে প্রথম কিছু দ্বিধা দেখা দিল। ওয়ালটনের ভেক ধরে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া কি ওর পক্ষে ঠিক হবে ? গাড়িতে আলোর ব্যবস্থা বেশ ভালই। এবং কোনও-কোনও ওয়েটারের দৃষ্টিশক্তিও খুব তীক্ষ্ণ। তবে রেস্তোরাঁ-কারেই ও হাজির হল শেষ পর্যন্ত। তাতে অঘটনও কিছু ঘটল না। সব ওয়েটারই ওকে ওয়ালটন বলে ধরে নিল। একজন শুধু মন্তব্য করল, ও নাকি আগের চেয়ে একটু রোগা হয়ে গেছে। ব্রাকলে অবশ্য কথাবার্তা বিশেষ বলল

না। শুধু হুঁ-হাঁ দিয়েই কাজ সারল। কারণ ওর দাঁতের গড়ন ওয়ালটনের মতো নয়, বড় বেশি এবড়ো-খেবড়ো। কথা বলতে গেলেই ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। ট্রেনটা নিউ স্টেনে পৌঁছবার ঠিক মুখেই ও ডাইনিং কার ছেড়ে বেরিয়ে এল। হাঁটা-চলার মধ্যে সামান্য খোঁড়ানোর ভাবটা বজায় রাখল নিখুঁতভাবে।

নিজের কম্পার্টমেন্টে ফিরে এসে ব্রাকলে বেশ গর্বিত হল মনে মনে। নিজেকে একজন উঁচুদরের অভিনেতা বলে বোধ হল ওর। কত নির্ভুলভাবেই না ওয়ালটনের ভূমিকায় অভিনয়টা করে গেল! এর পরের যেটুকু করণীয় কর্তব্য সেটা খুবই সহজ-সরল। এবং সমস্ত কর্মসূচীও আগে থেকে ভেবেচিন্তে ঠিক করে রেখেছে।

এই নিউ স্ট্রীটেই ওয়ালটন হঠাৎ লোকচক্ষুর সামনে থেকে বরাবরের মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে। ওর স্যুটকেসটা অবশ্য দাবিহীন অবস্থায় রেলস্টেশনের মাল-গুদোমে জমা পড়বে। পরে যখন ওয়ালটনকে নিয়ে হইচই শুরু হবে তখন পুলিশের লোকজন ওর এই পরিত্যক্ত স্যুটকেসটাও খুঁজে পাবে। ইতিমধ্যে ব্রাকলে আবার স্ববেশ ধারণ করে লন্ডনে ফিরে আসবে। এবং বৌলটার মিউজ থেকে নিজের ভ্যান নিয়ে নির্বিঘ্নে কেন্টে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানেও একটা গ্যারেজ ভাড়া নেওয়া আছে ব্রাকলের। এই গ্যারেজের শান-বাঁধানো মেঝে খুঁড়ে তার মধ্যেই শুইয়ে রাখবে ওয়ালটনকে। তারপর আবার নতুন করে সিমেন্ট লেপে দেবে গর্তের ওপর। ব্রাকলের এই কীর্তির কথা লন্ডন থেকে একশ মাইল দূরে কেন্টের এই মাটির নীচেই চাপা পড়ে থাকবে চিরকালের জন্য।

ওয়ালটনের খোঁজ করতে-করতে ব্রিমিংহ্যাম পর্যন্ত এসে পৌঁছবে অনুসন্ধানকারী পুলিশের দল। এখানে পৌঁছবার পর ওরা নিখোঁজ, ব্যক্তির আর কোনও হদিশ খুঁজে পাবে না। ওয়ালটনের বাপ-মা যদিও আজ তাঁদের ছেলের জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন। তবে ছেলে না পৌঁছলে তাঁরা নিশ্চয় তড়িঘড়ি করে আজ রাতেই পুলিশে খবর দিতে যাবেন না। প্রথম খোঁজ-খবর শুরু হবে ওয়ালকিনশ্-এর দোকান থেকে। কাল সকালে হীরেগুলো ওদের দোকানের কারিগরদের কাছে পৌঁছে দেবার কথা আছে ওয়ালটনের। ওয়ালটন সময়মতো না পৌঁছলে স্বভাবতই ওরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে। ওর এই অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইবে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ তখন সব ব্যাপারটার তদন্ত করবে। তবে তারা যখন জানতে পারবে জুয়ায় ক্রমাগত হারতে-হারতে ওয়ালটন একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল, দেনায় তার মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে—তখন ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে তাদের আর বিশেষ অসুবিধে হবে না। মনে করবে, একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রলোভনে পড়ে মোটা টাকা মেরে দিয়ে গায়েব হয়ে গেছে। দু'চারদিন ঘোরাঘুরির পর তারাও অবশেষে হাল ছেড়ে দেবে। তা ছাড়া জীবিত ওয়ালটনকেই তারা খুঁজে বেড়াবে, কেউ মৃত ওয়ালটনের খোঁজ করবে না।

ট্রেনের জানলা দিয়ে অদূরে নিউ স্ট্রীট স্টেশনের আলো দেখা গেল। ওয়ালটন সম্পর্কে পাঁচজনের কাছে যে মিথ্যে ধারণাগুলোর সৃষ্টি করেছিল সেই ব্যাপারেই মনে মনে চিন্তা করছিল ব্রাকলে। ওর কাজ হাসিলের পক্ষে এইটুকুই কি যথেষ্ট ? সংবাদপত্র বিক্রেতা, ট্যাক্সি ড্রাইভার, স্টেশনের কুলি বা ডাইনিং কারের ওয়েটার —সবাই কি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পুলিশকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে ? এরা কি নিশ্চিতভাবে তাকে স্মরণে আনতে পারবে ? তাদের সাক্ষ্যের মধ্যে যদি কোথাও কোনও গুরুতর অসঙ্গতি থেকে যায় ? কেউ যদি ওয়ালটনের কথা ঠিকমতো মনে করতে না পারে ? নিজেকে ওয়ালটন হিসেবে সকলে চোখের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা ছাড়া ব্রাকলের পক্ষে আর বিশেষ কিছু করার ছিল না। ওর এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা পুরোপুরি সার্থক হবে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই।

প্রথম শ্রেণীর এই কামরায় ব্রাকলের সঙ্গে আর একজনমাত্র বয়স্কা মহিলা ছিলেন। নানান কথা ভাবতে-ভাবতে তাঁর দিকেই অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ব্রাকলে। হঠাৎই বিদ্যুৎ চমকের মতো ওর মাথায় মতলবটা খেলে গেল। এখনও এমন কিছু ও করতে পারে যার ফলে এই স্টেশনে ওয়ালটনের উপস্থিতি সম্পর্কে পুলিশ সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়। ভদ্রমহিলার স্যুটকেসটা মাথার ওপর বাঙ্কে রাখা আছে। ব্রাকলের অর্থাৎ ওয়ালটনের স্যুটকেসটা ঠিক তার পাশেই। এবং দুটো স্যুটকেসই অবিকল একই রকম দেখতে। সম্ভবত দুটোই অক্সফোর্ড স্ট্রীটের কোনও দোকান থেকে কেনা। ওখানে এই ধরনের সস্তার স্যুটকেস প্রচুর বিক্রি হয়। এমন কী হঠাৎ দরকার হতে পারে ভেবে ব্রাকলে নিজেও ঠিক এইরকমের একটা স্যুটকেস কিনে রেখেছিল। তবে সেটার আর দরকার লাগেনি। স্বয়ং ঈশ্বরই যেন সুযোগটা এনে দিয়েছেন ব্রাকলের সামনে। ব্রাকলেও সেই সুযোগ নিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করল না। ট্রেন স্টেশনে ঢুকতে-না-ঢুকতেই ও উঠে দাঁড়িয়ে বাঙ্ক থেকে ভদ্রমহিলার স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে দ্রুতপায়ে নেমে গেল কামরা ছেড়ে।

ওর এই মতলবটা যেন ম্যাজিকের মতো কাজ করল। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে দশ বারো গজ এগোতে-না-এগোতেই পেছন থেকে ভদ্রমহিলা এসে ওকে ধরে ফেললেন।

—মাপ করবেন, —তাঁর গলা দিয়ে একরাশ বিরক্তি ঝড়ে পড়ল। —ভুল করে আপনি আমার স্যুটকেসটা নিয়ে চলে এসেছেন। আপনার স্যুটকেসটা এখন আমার হাতে।

ব্রাকলে সৌজন্যের হাসি হাসল।—আমার মনে হয় ভুলটা আপনি-ই করছেন, ম্যাডাম। আপনার ব্যাগ আপনার হাতেই আছে। দুটো ব্যাগ একই রকম দেখতে, তাই হয়তো ...

—না, ভুল আমি করিনি। —এবারে একটু জোরেই চেঁচিয়ে উঠলেন মহিলা। তিনি তাঁর নিজের ভূমিকাটুকু সুন্দরভাবে পালন করে চলেছেন। মনে মনে পুলকিত হল ব্রাকলে। এটাই ও চেয়েছিল। —স্যুটকেস আমার মাথার ওপর বাঙ্কে রাখা ছিল। নিজের স্যুটকেস চিনতে আমার কখনও ভুল হয় না।

ব্রাকলে যেমন আশা করেছিল, দু'জনের এই তর্কবিতর্কের মাঝখানেই একজন পুলিশ কর্মচারী এসে পড়লেন। —আপনাদের গণ্ডগোলটা কী নিয়ে ?

ভদ্রমহিলা জবাব দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন, কিন্তু ব্রাকলে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। সুযোগটা ও হাতছাড়া হতে দিল না।

—দেখুন অফিসার, এই মহিলা মনে করছেন ভুল করে আমি ওঁর ব্যাগটা নিয়ে এসেছি। যদিও ভুল আমি করিনি। আমি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। আমার নাম ওয়ালটন। লন্ডনে নিকোলাস ম্যালার্ডের যে বিখ্যাত জুয়েলারি দোকান আছে, আমি তার একজন কর্মচারী। যদি চান তো আমার পরিচয়-পত্রও আমি আপনাকে দেখাতে পারি।

—না ... না, আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। —পুলিশ কর্মচারীটি হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন ব্রাকলেকে।—চুরির কোনও অভিযোগ তো আপনার বিরুদ্ধে আনা হয়নি।

—চুরির কথা আমি একবারও বলিনি। —এবারে মুখ খুললেন মহিলা। —আমার বক্তব্য, ভদ্রলোক ভুল করছেন। ওটা যে আমার ব্যাগ, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

—ঠিক আছে, ম্যাডাম। আমি যখন এসে পড়েছি তখন আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই।

—অফিসারের কথার সুরে মনে হয় তিনি যেন বেশ একটা মজার খোরাক পেয়েছেন। স্যুটকেস দুটো হাতে নিয়ে তিনি প্ল্যাটফর্মের একধারে একটা খালি বেঞ্চের ওপর পাশাপাশি রাখলেন।

—দুটোই দেখছিল অবিকল এক রকম। আপনারা কেন যে নিজের-নিজের স্যুটকেসের ওপর নামের লেবেল লাগিয়ে রাখেন না, সেটাই খুব অবাক ব্যাপার! সামান্য এই অসাবধানতার জন্যেই তো রোজ কত মালপত্র খোওয়া যায়। অথচ দোষটা চাপানো হয় লে কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে। হ্যাঁ, কী যেন আপনার নাম বললেন, মিঃ ...

—ওয়াটসন।

—আমি যদি এই স্যুটকেসটা খুলে দেখি, তাতে কি আপনার আপত্তি আছে ? তা হলে সহজেই সমস্যাটার মীমাংসা হয়ে যায়।

—আপনি স্বচ্ছন্দে খুলতে পারেন। আমার তরফ থেকে বিন্দুমাত্র আপত্তির কারণ নেই।

—ম্যাডাম, আপনার ?

—আমিও কোনও আপত্তি করব না।

—তাহলে এটাই খুলে দেখা যাক।

ওয়ালটনের স্যুটকেসটাই প্রথমে বেছে নিলেন তিনি। স্যুটকেসটা লক্ করা ছিল না। বোতামে সামান্য চাপ দিতেই ডালা খুলে গেল। স্টেশনের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করতে রাগল স্যুটকেশের ভেতরটা দেখা গেল নানান সাইজের অসংখ্য হীরে এবং আরও অনেক দামি-দামি পাথর একসঙ্গে ঠেসে রাখা হয়েছে তার মধ্যে। যেন কেউ খুব তাড়াতাড়ি করে জড় করেছে সেগুলো। তারপাশে রাখা আছে রবারের হাতল-লাগানো স্টীলের তৈরি একটা ভারী হাতুড়ি। হাতুড়ির মাথায় লালচে রক্তের দাগ। কয়েকটা শাদা চুলও জড়িয়ে আছে সেখানে। বৃদ্ধ নিকোলাস ম্যালার্ডের মাথার চুল। ওয়ালটন যেভাবে ফেলে এসেছিল, হতভাগ্য বৃদ্ধের মৃতদেহটা তখনও ফেন্টিম্যান স্ট্রীটের সেই ছোট দোকান-ঘরের মধ্যেই পড়েছিল।

কাঁটায় কাঁটায়

(ডাবল ট্রাবল

রবার্ট এডমন্ড অলটার

মিঃ ডার্বি পয়েন্ট টোয়েন্টি টু পিস্তলটা নামিয়ে রাখতে রাখতে টাইমপীসটার দিকে একপলক তাকিয়ে দেখলেন। সাতটা সতেরো। অর্থাৎ প্রতিদিন তিনি যে সময় ঘুম থেকে ওঠেন তার থেকে তেরো মিনিট আগে। এই তেরো মিনিট তিনি এমন কিছু কাজে অতিবাহিত করবেন যেটা তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক রুটিনের আওতায় পড়ে না। এমন কিছু জটিল কাজ নয়, তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ওপর নির্ভর করছে তাঁর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা। এক ধরনের মুচকি হাসি ছড়িয়ে পড়ল তাঁর ঠোঁটের প্রান্তে। দু চোখ ভরে নিজের কর্মকুশলতা দেখতে দশ সেকেন্ড সময় দিলেন তিনি।

পয়েন্ট টোয়েন্টি টু পিস্তলে ফায়ার করলে শব্দটব্দ বিশেষ হয় না। তার ওপর নলের মুখে যদি মোটা-সোটা বালিশ চেপে ধরে ফায়ার করা হয় তা হলে শব্দ তো একবারেই হয় না বললেই চলে। বালিশের মধ্যে শুধু ছোট মাপের একটা গর্ত হয়ে যায়, আর কোনও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে না। মনে মনে খুশি হলেন ডার্বি। আসলে মানুষটা তো তিনি খুবই গোছালো স্বভাবের। পিস্তলটা

সরিয়ে রেখে তিনি এবার পায়ে-পায়ে স্ত্রীর বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন। হেঁট হয়ে তাঁর দেহ থেকে কম্বলটা টেনে নিয়ে বিছানার একপাশে ভাঁজ করে রাখলেন। ডানলোপিলোর তোশকটা পুরু চাদরের ওয়াড় দিয়ে মোড়া ছিল। তার মাথার দিকটা ফাঁস দিয়ে আটকানো। ফিতের ফাঁস আলগা করে তার একটা দার খুলে ফেললেন ডার্বি। তাঁর স্ত্রীর বুদ্ধিসুদ্ধি বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। বুড়ি দাসীরা তাদের টাকাকড়ি যেমন তোশকের তলায় লুকিয়ে রাখে তাঁর স্ত্রীও ছিলেন তেমনি। দু'বছর হল বিয়ে হয়েছে তাঁদের। এবং তাঁর স্ত্রী কোথায় তাঁর টাকাকড়ি লুকিয়ে রাখেন সে-সম্পর্কে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল হতেও টানা একটা বছর সময় লেগেছে তাঁর। কিন্তু সেই টাকাটা হস্তগত করাটাই বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর কাছে।

তাঁর স্ত্রী নিজেকে একজন পঙ্গু বলেই ঘোষণা করেছিলেন। বিছানা ছেড়ে ওঠার মতো কোনও ক্ষমতাই নাকি তাঁর ছিল না। মিঃ ডার্বি অবশ্য এ-ব্যাপারে মনে মনে সন্দেহ পোষণ করতেন। কিন্তু যেহেতু প্রত্যহ সকাল সাড়ে আটটা থেকে সন্ধে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত তাঁকে বাড়ির বাইরে কাটাতে হয়, তাই বাধ্য হয়েই স্ত্রীর দাবিটা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হয়েছিল। তবে বরাবরই একটা সন্দেহ তাঁর মনে কাঁটার মতো বিঁধে থাকত যে, তিনি বাড়ির বাইরে বেরুলেই তাঁর স্ত্রীও বিছানা ছেড়ে উঠে ইচ্ছে মতো নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ান। এবং তাঁর বাড়ি ফেরার সময় হলেই তিনিও আবার ফিরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েন। তাঁর এই স্ত্রীর সুবাদে কুকুরের মতো জীবনযাপন করতে হচ্ছে তাঁকে। মহিলার যেন অভাব-অনুযোগের অন্ত নেই। সারাক্ষণই ফেউ-এর মতো স্বামীর পেছনে লেগে আছেন। এটা আনো ... ওটা করো, এই তাঁর মুখের বুলি। এবং মিঃ ডার্বি জানেন, মোটা-সোটা থলথলে দেহ নিয়ে তাঁর স্ত্রী সারাক্ষণ টাকার বান্ডিলের ওপর শুয়ে আছেন। যদিও তিনি কোনও দিন সেই টাকার বান্ডিলের নাগাল পেতেন না। অন্তত আজ সকালের আগে পর্যন্ত পাননি। এখন অবশ্য তাঁর স্ত্রী আর কোনও কথা বলবেন না, একটা শব্দ পর্যন্ত না। আর সেই নীরবতা মিঃ ডার্বির কানে যেন মধুর সঙ্গীতের মতো মনে হচ্ছে।

তোশকের তলা থেকে তিনি এবার ডলারের বান্ডিলগুলো বের করতে লাগলেন। পাঁচ দশ কুড়ি পঞ্চাশ ডলারের সব আলাদা আলাদা বান্ডিল। এখন যদিও গুনে দেখার সময় নেই, তার দরকারও নেই কোনও। তাঁর স্ত্রীর যে প্রচুর টাকা তা তিনি জানতেন। সে টাকা মহিলা কখনও ব্যাংকে রাখতেন না। শেয়ার মার্কেটে টাকা খাটাবার মতো বুদ্ধিসুদ্ধিও তাঁর ছিল না। বিয়ের আগে এ-সমস্ত খবরাখবরই তিনি সুকৌশলে জেনে নিয়েছিলেন। তা না হলে পঞ্চাশ বছরের এক গাবদাগোবদা মহিলাকে কেউ অন্তত ভালবেসে বিয়ে করতে যায় না। আর মহিলাটি এতই মাথামোটা এবং ঝগড়ুটে স্বভাবের যে দু'দণ্ড তাঁর সঙ্গে বসে কথা বলাও কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

এসব কথা ভাবতেই আলমারি থেকে ব্রিফকেসটা বের করে ডলারের বান্ডিলগুলো তার মধ্যে গুছিয়ে রাখতে শুরু করলেন মিঃ ডার্বি। হাতের কাজ শেষ করে যখন তিনি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা। বাথরুম থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে তিনি টুথপেস্ট, দাড়ি কামাবার সাজ-সরঞ্জাম, মোজা, জাঙ্গিয়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্র ব্রিফকেসের একধারে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখলেন। বাইরে কোথাও পাড়ি জমাতে গেলে এগুলো অপরিহার্য, এবং সঙ্গে নিতেও বিশেষ অসুবিধে হয় না। যদি তিনি একটা বড়সড় স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরুতেন তবে পাড়া পড়শিরা স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলী হয়ে উঠত। বর্তমানে কিছুতেই তিনি সেটা ঘটতে দিতে পারেন না। তার চেয়ে প্যারিসে গিয়েই না-হয় কয়েক প্রস্থ নতুন পোশাক-আশাক কিনে নেবেন। সেটা বরং অনেক বেশি সুবিধাজনক।

সাজগোজ করে ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে মিঃ ডার্বি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ঘরের বাইরে বেরুবার আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে একবার ঘাড় ফিরিয়ে স্ত্রীর বিছানার দিকে ফিরে তাকালেন।

—এখন তুমি শান্তিতে বিশ্রাম কর! —স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করলেন তিনি। —কেউ আর তোমায় বিরক্ত করতে আসবে না।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে নামতে অভ্যাস বশে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সাতটা চল্লিশ। মনে মনে সন্তুষ্ট হলেন তিনি। প্রতিদিনের মতো আজও ডার্বি তাঁর সময়ানুবর্তিতা নিখুঁতভাবে বজায় রেখে চলেছেন। এখন থেকে আটটা পঞ্চাশে বাস থেকে নামার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক সময় মতোই চলবে। বিগত দু বছর ধরে তিনি এই নিয়মেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রতিবেশিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, ডার্বিকে দেখে হাতের ঘড়ি মিলিয়ে নাও, সেটা আদৌ ভুল বলে না। বিশেষ করে আজ সকালে যখন প্রতিটি মুর্হর্তই দারুণভাবে মূল্যবান, সেখানে একটা সেকেন্ডও এদিক-ওদিক করা যাবে না। ডার্বির বাঁধা-ধরা সময় অনুযায়ী সবকিছু নির্দিষ্টভাবে এগিয়ে চলবে।

কিচেনের ঘড়িতে এখন সাতটা তেতাল্লিশ। নুন দিয়ে জরানো তিন টুকরো নরম শুওরের মাংস গ্যাস-স্টোভে ভাজতে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। নিজের নির্বুদ্ধিতার বহর দেখে অবাক হলেন মনে মনে। সকালে তিনি মাত্র দু টুকরো মাংস খান। বাকি টুকরোটা তাঁর স্ত্রীর জন্যে বরাদ্দ থাকে। আজও তাই পুরনো অভ্যেসমতো তিনটে টুকরোই নিয়েছিলেন। তাঁর গলা ঠেলে একটা খিলখিলে হাসি উঠে এল। অনেক কষ্টে দমন করলেন সেটা। এখন থেকে সব বিষয়ে তাঁকে আরও বেশি সতর্ক হতে হবে। প্রতিটি কাজ ভেবেচিন্তে হিসেবে করে করতে হবে।

ফ্রিজ থেকে দেখেশুনে দুটো মাত্র ডিম বের করে সেদ্ধ করতে দিলেন। খেজুরের পিণ্ড দিয়ে তৈরি আধ গেলাশ সিরাপ পান করলেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন সাতটা আটচল্লিশ। সকালের সংবাদপত্রটা দরজার সামনে পড়ে আছে। এখন সেটা নিয়ে আসার সময়, সেইসঙ্গে ট্যাবিকেও ভেতরে আনতে হবে।

প্রত্যেকদিন সকালে ট্যাবিকে ভেতরে আনার সময় মিঃ ডার্বি মনের মধ্যে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ অনুভব করেন। তাঁর প্রতিবেশী ক্রেগের স্ত্রীর মতো মিসেস ডার্বিও ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে অন্তন্ত স্পর্শকাতর। নোংরা জিনিস তিনি একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না। তাই মিঃ ডার্বির ট্যাবি নামে আদরের বেড়ালটা তাঁর দু'চক্ষের বিষ। এই কুৎসিত জন্তুটা সর্বত্র শুধু পশমের মতো রেঁওয়া ছড়িয়ে বেড়ায়। সেইজন্য প্রতিদিন সকালে স্ত্রীর সঙ্গে কোনও কথাবার্তা না বলেই ট্যাবিকে ঘরের মধ্যে এনে হাজির করেন মিঃ ডার্বি। অত্যাচারী স্ত্রীর বিরুদ্ধে এটা একজাতীয় নিরুচ্চার বিদ্রোহ বলেই মনে হয় তাঁর। এর ফলে মানসিক আনন্দও পান প্রচুর পরিমাণে।

সদর দরজার সামনে থেকে হেঁট হয়ে পত্রিকাটা তুলে নিয়ে ডার্বি মোলায়েম আদুরে গলায় ডাকলেন-ট্যাবি...ট্যাবি...ট্যাবি!

তাঁর পাশের বাড়ির প্রতিবেশী বিধবা মিসেস রীজ নিজের ছোট বাগানটা পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ডার্বিকে দেখে হাসিমুখে ফিরে তাকালেন। সেই ফাঁকে হাতে-বাঁধা রিস্টওয়াচের দিকেও তাকিয়ে দেখলেন এক ঝলক। —কী ব্যাপার, মিঃ ডার্বি ? —তাঁর গলায় বিস্ময়ের সুর ফুটে উঠল। —হয় আপনি আজ দু মিনিট আগে এসেছেন, না-হয় আমার ঘড়ি দু মিনিট স্লো যাচ্ছে।

নিজের সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারে এ-ধরনের হালকা মন্তব্য শুনে ক্ষুব্ধ হলেন মিঃ ডার্বি। তবে বিশেষ করে মিসেস রীজ যে আজ তাঁকে লক্ষ করেছেন এটা তাঁর পক্ষে মস্তবড় একটা সুখবরই বলতে হবে। তাহলেও, তাঁর ঘড়িতে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে, এবং তিনি নির্দিষ্ট সময়ের দু মিনিট আগে এসে পৌঁছেছেন, এ-কথা শোনাটাও তাঁর পক্ষে ভারী অস্বস্তিকর। তিনি নিজে কি কোনও ভুল করেছেন ? কিন্তু না, খুব সম্ভবত মিসেস রীজের ঘড়ি-ই আজ স্লো যাচ্ছে। সেকথা তাঁকে জানিয়ে দিতেও দ্বিধা করলেন না।

—আমার বিশ্বাস, আপনার ঘড়িতেই কোনও গণ্ডগোল ঘটেছে, মিসেস রীজ। কারণ রোজ রাতে টেলিফোন অপারেটরকে ফোন করে আমি সময় মিলিয়ে নিই। ... এবং আপনি নিশ্চয় জানেন, টেলিফোন ভবনের ইলেকট্রনিক ঘড়িতে কখনও ভুল সময় দেয় না।

মিসেস রীজ সমর্থনের ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন। —আমি আপনাকে ভাল করেই জানি, মিঃ ডার্বি। আপনি নিশ্চয় ঠিকই বলছেন। জীবনে কখনও আপনার সময়ের একচুল নড়চড় হতে দেখিনি।

ইতিমধ্যে ট্যাবি একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষিপ্রপায়ে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হল। ট্যাবির দ্রুতবেগে ভেতরে ঢুকে-যাওয়া দেখে মিসেস রীজ মৃদু হাসলেন।

—বেড়ালটা সত্যিই আপনার ভারী প্রিয়! —বলতে বলতে আবার মুচকি হাসি ফুটে উঠল মহিলার ঠোঁটের ফাঁকে। তাঁর হাসি দেখে বুঝতে পারা যায় এই অবলা প্রাণীটিকে নিয়ে মিঃ ডার্বিকে রোজ যে অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় সে-সম্পর্কে তিনি পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল।

মিঃ ডার্বি আবার তাঁর হাতঘড়ির দিকে ফিরে তাকালেন। সাতটা একান্ন। —আমাকে মাপ করবেন, মিসেস রীজ, এতক্ষণে ডিমগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে।

কিচেনে ফিরে এসে সেদ্ধ ডিমদুটোর খোসা ছাড়ালেন তিনি। বেড়ালটা সারাক্ষণ করুণ সুরে মিঁউমিঁউ করতে করতে তাঁর পায়ে-পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা পাত্রে তাকে তার দৈনিক বরাদ্দ দুধটুকু ঢেলে দিলেন। অবশেষে নিজের প্রাতরাশের ডিশটা হাতে নিয়ে ডাইনিং রুমে গিয়ে ঢুকলেন। ডাইনিং রুমের দেওয়াল ঘড়িতে তখন সাতটা পঞ্চান্ন। মিঃ ডার্বি ন্যাপকিনটা কোলের ওপর বিছিয়ে প্রাতরাশ শুরু করলেন।

যখন তাঁর প্রাতরাশ শেষ হল তখন আটটা দশ। সবেমাত্র কাগজের হেডলাইনগুলোর ওপর চোখটা একবার বুলিয়ে নিতে যাবেন, হলঘরের মধ্যে ফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দ করে বেজে উঠল। ডার্বির ভ্রূ জোড়া কুঁচকে গেল। টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে তিনি ব্যাজার মুখে ফোন ধরলেন।

—হ্যালো ডার্বি, —রিসিভারটা কানে তুলতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল —নিশ্চয় আমি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিইনি, তাই না ?

বক্তা যেন তাঁর পাশের আর কাউকে উদ্দেশ্য করে কী একটা মন্তব্য করলেন যেটা ডার্বি ঠিকমতো বুঝতে পারলেন না।

ফোনটা অবশ্য ডার্বিকে খুব বেশি চমকে দিতে পারেনি। এরজন্য মনে মনে তিনি যে খানিকটা প্রতীক্ষাই করছিলেন বলা চলে। স্মিটি তাঁর এক সহকর্মী। একই অফিসে পাশাপাশি চেয়ারে বসে তাঁরা কাজ করেন। বন্ধুর এই নিখুঁত সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে তিনি প্রায়ই ঠাট্টা-তামাশা করে থাকেন।

—না, স্মিটি, —মিঃ ডার্বি বন্ধুকে আশ্বস্ত করলেন—আমি এখন সবেমাত্র প্রাতরাশ সারতে যাচ্ছিলাম।

হো হো করে হেসে উঠলেন স্মিটি। —এইমাত্র আমার বন্ধুদের সেই কথাই বলছিলাম। এমন কী তুমি ছুটিতে থাকলেও তোমার নিয়মের একচুল পরিবর্তন ঘটবে না। কি, ঠিক বলিনি ?

মিঃ ডার্বি জোর করে কণ্ঠস্বরে হাসির আমেজ আনলেন। —হ্যাঁ, আমি জীবনভর ঘড়ি ধরেই চলব। অন্তত যতদিন পর্যন্ত অথর্ব হয়ে না পড়ছি ...

রিসিভার নামিয়ে রেখে ডার্বি এবার নিজের চারপাশে ফিরে তাকালেন। সারা বাড়ি নিথর, নিস্তব্ধ। —আর কিছুই করণীয় নেই। —স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করলেন তিনি। —এখানে যা করার ছিল বরাবরের মতো শেষ করে ফেলেছি।

চেয়ারে গা এলিয়ে তিনি এবার সন্তুষ্ট চিত্তে কাগজের ওপর চোখ ডোবালেন। পাড়া-পড়শিদের কোনও ধারণা নেই যে আজ থেকে তাঁর ছুটি শুরু হয়েছে। সাড়ে আটটায় যখন বাড়ি ছেড়ে বেরুবেন প্রতিবেশীরা ভাববে প্রত্যেকদিনের মতো আজও তিনি অফিস যাচ্ছেন। সন্ধে সাড়ে ছ'টায় না ফিরলে ঘটনাটা হয়তো তাদের নজরে পড়বে। সাড়ে সাতটাতেও যখন তিনি ফিরবেন না তখন তারা নিশ্চয় একটু চিন্তা-ভাবনা শুরু করবে। এবং সাড়ে আটটা নাগাদ তাঁর এই সময়ানুবর্তিতার এতবড় ব্যতিক্রম দেখে তারা রীতিমতো বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। সম্ভবত সাড়ে ন'টা নাগাদ নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে মিঃ ডার্বির বাসায় হাজির হবে। তারপর আসল ঘটনাটা পুলিশ জানতে পারবে।

অবশ্য তাতে ডার্বির কিছু যায় আসে না। বাস থেকে নেমে তিনি একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা এয়ারপোর্টে পৌঁছবেন। সেখান থেকে ন'টা কুড়ির প্লেন ধরে নিউ ইয়র্ক। নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিসের প্লেন ছাড়বে বেলা সাড়ে দশটায়। পুলিশ যখন তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহের সন্ধান পাবে তখন তিনি আমেরিকা ছেড়ে হাজার-হাজার মাইল দূরে ইউরোপের এক শহরে। অবশ্য একটা নতুন নাম নিতে হবে তাঁকে, টাকা দিয়ে একটা জাল পাসপোর্টেরও ব্যবস্থা করতে হবে। তারপরই পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে মিঃ ডার্বির অস্তিত্ব।

সদর দরজার কলিং বেলটা যখন বেজে উঠল তখন ভীষণভাবে চমকে গেলেন তিনি। মনে হল কেউ যেন তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে হোঃ বলে চেঁচিয়ে উঠল জোরে। কাগজটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে শঙ্কিত দৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আটটা একুশ। এ-সময় কোন বুড়বাক আবার তার দরজায় এসে ঘণ্টি বাজাচ্ছে ?

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ রাগ-রাগ মুখেই তিনি দোর খুললেন। দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে একজন সেলসম্যান হাসিমুখে তাঁকে স্বাগত জানাল। তার এক হাতে একটা খোলা বাক্স। বাক্সের মধ্যে কয়েক ধরনের ব্রাশ, আর অদ্ভুত ধরনের কয়েকটা যন্ত্রপাতি। অন্য হাতে একটা বড় ব্যাগ। তার গায়ে মোটা-মোটা হরফে কোম্পানির নাম লেখা।

—মিঃ ডার্বি, আপনার অর্ডার মতো আমি সবকিছু নিয়ে এসেছি।

চোখ পিটপিট করলেন ডার্বি। —আমার অর্ডার ?

—হ্যাঁ, আপনার এই ব্রাশগুলো ... মানে আপনার স্ত্রীর। —সেলসম্যান মুচকি হাসল। এবার তাঁকে বেশ একটু বিচলিত দেখাল। —আমার স্ত্রীর ?

সেলসম্যানের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে সেখানে একটা ইতস্ততভাব ফুটে উঠল। —হ্যাঁ ... স্যার, গত হপ্তায় আপনার স্ত্রী-ই আমাকে এগুলোর অর্ডার দিয়েছিলেন।

মিঃ ডার্বি ঘড়ির দিকে তাকালেন। আটটা বাইশ।

আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না! —অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তিনি বললেন। —আমার স্ত্রী কী করে ব্রাশের অর্ডার দেবেন ? তিনি তো পঙ্গু। বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন না!

এবারে সত্যিই বেশ বোকা-বোকা দেখাল সেলসম্যানকে। লেটার-বক্সের গায়ে লাগানো বাড়ির নম্বরটার দিকে নজর বোলাল সে। তারপর কোটের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দুটো মিলিয়ে দেখল ভাল করে।

—কিন্তু ... কিন্তু আপনি-ই তো মিঃ ডার্বি, তাই না ? এই বাড়ি থেকেই তাহলে আমায় অর্ডার দিয়েছিলেন। বেসিন সাফ করার জন্যে একটা নাইলন ব্রাশ, নাইলনের তৈরি একটা চুলের ব্রাশ, ব্লু মেমারি নামে হাত ধোওয়ার লোশন, বাথরুমের গন্ধ দূর করার জন্যে একটা পাইন সেন্ট ... এ-সমস্তই আমি মিসেস অ্যালমো ডার্বির অর্ডার মাফিক নিয়ে এসেছি। গত হপ্তায় এই দরজার সামনেই ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। দিনটা ... দিনটা ছিল সোমবার।

ব্যাপারটা তা হলে মিথ্যে নয়। এমন একটা সন্দেহ অনেক আগেই তাঁর মনে দানা বেঁধেছিল। তাঁর স্ত্রী মোটেই পঙ্গু ছিলেন না। ভেতর-ভেতর আরও রেগে গেলেন তিনি দু-বছর ধরে পঙ্গু হবার ভান করে বিছানায় পড়ে থেকে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে গেছেন তাঁর স্ত্রী। ক্রীতদাসের মতো তাঁকে খাটিয়ে মেরেছেন সারাক্ষণ। ঘরদোর পরিস্কার, রান্নাবান্না থেকে শুরু করে গৃহস্থালির যাবতীয় খুঁটিনাটি একা হাতে সামাল দিতে হয়েছে তাঁকে। এমন কী খাবার-দাবার তৈরি করে দোতলায় স্ত্রীর ঘরে পৌছে দিতে হয়েছে, এবং খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে এঁটো বাসনপত্তর আবার তিনি-ই নিজের হাতে নীচে নামিয়ে এনেছেন। ... এখন তাঁর আক্ষেপ হল, কেন যে ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি তাঁকে এগিয়ে দেননি ... আটটা তেইশ।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে! —মিঃ ডার্বি ব্যস্ত হাতে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলেন।

—আমাদের এখন আর এসব কিছুর প্রয়োজন নেই।

সেলসম্যান এবার রুখে দাঁড়াল। —আপনি বলছেন, চাই না। কিন্তু আপনার স্ত্রীর নির্দেশ মতোই এগুলো আমি নিয়ে এসেছি। আপনি বরং দয়া করে মিসেস ডার্বিকেই একবার ডেকেদিন। তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি কথা না বলে ...

মিঃ ডার্বি এবার বেশ হকচকিয়ে গেলেন। —কী বলবেন ? আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন ? কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। তিনি এখন ঘুমচ্ছেন, ... না ... না, বিছানায় বসে প্রাতরাশ সারছেন। আমি তো আপনাকে বললাম, তিনি অসুস্থ।

বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। —আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। তাঁর কথাবার্তা বা আচার-ব্যবহার যে খানিকটা অসংলগ্ন হয়ে পড়ছে, তাও তিনি অনুভব করতে পারলেন। লোকটা হয়তো কিছু সন্দেহ করছে মনে মনে। সাবধান, ডার্বি সাবধান! এই মুহূর্তে যেন কিছু ভুলচুক করে বোসো না।! ওর হাত থেকে নিরাপদে নিষ্কৃতি পাবার এখনও সুযোগ আছে। তারপরেও সবকিছু ঠিকমতো করার সময় থাকবে।

—কত বিল হয়েছে ? —জানতে চাইলেন ডার্বি।

সেলসম্যানের মুখে আবার হাসি ফুটল। পকেট থেকে এক গোছা বিলের মধ্যে মিসেস ডার্বির বিলটা খুঁজে বের করল সে। —এই যে স্যার, সব মিলিয়ে চার ডলার একুশ সেন্ট। এর মধ্যে ট্যাক্সও ধরা আছে।

আটটা চব্বিশ। মিঃ ডার্বি মানি ব্যাগের জন্যে পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিলেন। তাঁর মনে পড়ল টাকাকড়ি সব ব্রিফকেসের মধ্যে রয়ে গেছে। —এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে ব্রিফকেসের মধ্যে থেকে একটা নোট বের করে এনে সেলসম্যানের হাতে দিলেন। নোটটা হাতে নিয়ে সেলসম্যান বেশ দমে গেল। —পঞ্চাশ ডলারের নোট ? কিন্তু এত খুচরো তো এখন ...

মিঃ ডার্বির গলা চিরে একটা অস্ফুট আর্তনাদ উঠে এল। তিনি ভেবেছিলেন নোটটা পাঁচ ডলারের। তাড়াতাড়ি লোকটার হাত থেকে নোটটা ছিনিয়ে নিলেন তিনি। —দাঁড়ান, দেখছি। পাঁচ ডলারে নোটও বোধহয় আমার কাছে রয়েছে।

প্যাকেট হাতড়ে পাঁচ ডলারের নোট খুঁজতে খুঁজতে ডাইনিং রুমের ঘড়িটার দিকে তাঁর চোখ পড়ল। আটটা ছাব্বিশ। —আমাকে এখন সংযত হতে হবে। —দাঁতে দাঁত চেপে নিজের উদ্দেশে তিনি বললেন। —হতভাগাটা যেন আমার আচার-আচরণে কোনওরকম সন্দেহ করতে না পারে। —প্রায় দৌড়েই তিনি আবার সেলসম্যানের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কী আশ্চর্য! ব্যালেন্স ফেরত দিতে এত দেরি করছে কেন লোকটা ? মনে হচ্ছে যেন সামান্য ক'টা খুচরো গুনতে অনন্তকাল কাটিয়ে দেবে!

—আপনার বিল হয়েছে চার ডলার একুশ সেন্ট। তার মানে পাঁচ ডলার থেকে উনআশি সেন্ট ফেরত দিতে হবে। —পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বিড়বিড় করল ও। —হ্যাঁ ... এই যে, একটা পঞ্চাশ আর একটা পঁচিশ। তা হলে হল পঁচাত্তর। বাকি রইল চার সেন্ট। অন্য পকেট হাতড়ে দু সেন্ট আর এক সেন্টের দুটো কয়েন বের করে আনল। পঁচাত্তর আর তিন আটাত্তর। এখনও এক সেন্ট ...

আটটা আটাশ। মিঃ ডার্বি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। —থাক ... থাক, ওর আর দরকার নেই, এক সেন্টের জন্যে...

—না ... না, তা কি হয়! এই যে পেয়ে গেছি।

প্যালেসটা হাতে নিয়ে মিঃ ডার্বি দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেলসম্যান আবার নক্ করল।

মিঃ ডার্বি সজোরে নিজের কপাল চাপড়ালেন। তারপর কোনওরকমে নিজেকে সামলে রেখে দরজা খুললেন। সেলসম্যান তখনও হাসি-হাসি মুখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা প্যাকেট। —কী ভুলো মন স্যার, আপনার! আসল অর্ডারটাই ডেলিভারি নিতে ভুলে গেছেন।

অবশেষে দরজা বন্ধ করে ডার্বি আবার ভেতরে গেলেন। প্যাকেটটা তখনও তাঁর হাতেই ধরা আছে। এই নতুন ব্রাশগুলো তিনি কোনওদিন ব্যবহার করতে পারেন না। অনর্থক কয়েকটা ডলার গচ্চা দিতে হল।

আটটা তিরিশ।

দ্রুতহাতে ডার্বি এবার ব্রিফকেসটা তুলে নিলেন। স্ট্যান্ড থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় চাপালেন। একটু কেশে গলাটা পরিস্কার করে নিলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধলেন, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। বাইরে থেকে টেনে দরজাটা বন্ধ করার সময় মনে মনে ভাবলেন, এই শেষ। আর কখনও এ দরজা তাঁকে বন্ধ করতে হবে না।

সবকিছু ঠিকই আছে। এমন কী নিজের সময়ানুবর্তিতাও সঠিকভাবে বজায় রাখতে পেরেছেন। শুধু অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি উত্তেজিত, এই যা। তবে হাঁটা-চলার মধ্যে দিয়ে সে ভাবটুকু নিশ্চয় কাটিয়ে উঠতে পারবেন। চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটিয়ে তিনি সরু লন পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

মিসেস রীজ নিজের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডার্বির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন তিনি। —এখন আমি আমার রিস্টওয়াচ মিলিয়ে নেব, মিঃ ডার্বি। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আট। আমি রোজ আপনাকে দেখেই ঘড়ি মেলাই।

প্রত্যুত্তরে ডার্বি মৃদু হাসালেন। তবে কোনও জবাব দিলেন না।

—আপনার স্ত্রী তাঁর আজকের প্রতরাশটা ভাল করে খেয়েছেন তো? চলমান ডার্বিকে উদ্দেশ্য করে পেছন থেকে তিনি বললেন। —তাঁর শারীরিক যন্ত্রণাটাই বা আজ কেমন আছে? মিঃ ডার্বি রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারলেন না। যদিও সেজন্যে তাঁর চার সেকেন্ড সময় নষ্ট হল।—আমি আজ তাঁর জন্যে বিশেষ ধরনের প্রাতরাশের বন্দোবস্ত করেছি।—জবাব দিলেন তিনি।—আজ আর তাঁর কোনও জ্বালা-যন্ত্রণাও নেই।

এয়ারপোর্টের বড় ঘড়িতে তখন দশটা পনেরো। প্যারিসে যাবার যাত্রীরা সব লাইন দিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মিঃ ডার্বি নিজেকে বেশ হালকা বোধ করছেন। তাঁর মনটাও এখন বেশ ফুরফুরে আমেজে ভরে উঠেছে। সবকিছু বেশ ভালয় ভালয় চুকে গেছে। এখন যেন অনন্ত সময় রয়েছে তাঁর হাতে। যা-কিছু ভয়, উৎকণ্ঠা, সমস্যা সবই এখন তুচ্ছ বলে মনে হচ্চে। তিনি তখন এতই

খোসমেজাজে ছিলেন যে, গেটের মুখে দাঁড়িয়ে যে ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে যাত্রীদের পাসপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা রকছিলেন তার দিকেও ভাল করে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি।

কিন্তু মিঃ ডার্বি যখন তাঁর পাসপোর্ট আর টিকিট নিয়ে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে হাজির হলেন, তখন মাথায় চ্যাটাল টুপি আর গায়ে লম্বা ওভারকোট-পরা সেই ভদ্রলোক চোখ তুলে ডার্বির মুখের দিকে তাকালেন। তারপর পকেট থেকে ধাতুর তৈরি একটা চকচকে ব্যাজ বের করে ডার্বিকে দেখালেন। —আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে, মিঃ ডার্বি। খুনের অভিযোগে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। ...

ভদ্রলোক হয়তো আরও কিছু বলেছিলেন, যদিও তার একটা বর্ণও ডার্বির কানে গিয়ে পৌঁছয়নি। তাঁর মগজের মধ্যে যেন একটা দমকা ঝড় উঠল। সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

—কিন্তু কীভাবে ... কীভাবে —ভদ্রলোক যখন তাঁকে অপেক্ষারত যাত্রীদের লাইন থেকে বাইরে বের করে আনছিলেন, তখন বিভ্রান্ত-চিত্তে প্রশ্ন করলেন তিনি —এত শীগগির খবরটা আপনারা জানতে পারলেন ?

চেষ্টা করেও ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাঁর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। —আপনি এবং আপনার স্ত্রী দু'জনেই একবারে ঘড়ি ধরে চলেন। আপনাদের প্রতিটি কাজকর্মই নিখুঁতভাবে সময়ের ছকে বাঁধা।

—আমরা মানে ? আমার স্ত্রী আবার সময়মতো কী করতেন ?

—আপনি জানেন না ? —মনে মনে আরও বেশি মজা পেলেন ইন্সপেক্টর। —তা হলে শুনুন, প্রত্যেকদিন সাতটা উনপঞ্চাশে আপনি খবরের কাগজটা আনার জন্যে সদর দরজা খুলতেন। সেই সময় আপনার আদরের বেড়ালটাও ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির ভেতর ঢুকত। আপনি এত নিখুঁতভাবে ঘড়ি ধরে চলতেন যে, আপনার পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা মিসেস রীজ নাকি আপনাকে দেখে তাঁর হাতঘড়ি মিলিয়ে নিতেন। প্রত্যেকদিন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় অফিসে যাবার জন্যে আপনি বাড়ি থেকে বেরোন। এবং ঠিক এর দশ মিনিট বাদে আটটা চল্লিশে আপনার স্ত্রী ব্যাজার মুখে সদর দরজা খুলে বেড়ালটার নড়া ধরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতেন।

একটু থেমে আবার শুরু করলেন ভদ্রলোক। —কিন্তু আজ সকালে মিসেস ডার্বি তাঁর প্রাত্যহিক রুটিন-মাফিক বেড়ালটাকে বাইরে বের করে দেন নি। তার ফলে মিসেস রীজ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জানতেন আপনার স্ত্রী অসুস্থ। তাঁর গুরুতর কিছু হল কি না সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্যেই তিনি আপনার বাড়ি গিয়েছিলেন। আর তখনই ...।

।। সমাপ্ত ।।